নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতনতা বিষয়ক নির্দেশিকা

শিশু অধিকার ইউনিট
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতনতা বিষয়ক নির্দেশিকা

শিশু অধিকার ইউনিট
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতনতা বিষয়ক নির্দেশিকা

প্রণয়নে
মমি মঞ্জুরী চৌধুরী, সহকারী সমন্বয়কারী, প্রশিক্ষণ ইউনিট, আসক
সাজ্জিদ আহমেদ, সিনিয়র প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ ইউনিট, আসক
সানজিদা শান্তা, কাউন্সেলর, সাইকো সোশ্যাল কাউন্সেলিং ইউনিট, আসক
অম্বিকা রায়, সমন্বয়কারী, শিশু অধিকার ইউনিট, আসক
অনিল চন্দ্র মন্ডল, সিস্টেম এনালিস্ট, প্রশাসন ইউনিট, আসক
মাহফুজুর রহমান, আইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রশাসন ইউনিট, আসক
গাজী মাহফুজ উল কবীর, আইন উপদেষ্টা, ক্রাইম রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস ফাউন্ডেশন (ক্রাফ)

সম্পাদনায়
শাহীন আখতার, সিনিয়র সম্পাদক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মো. মকছুদ মালেক, উপপরিচালক, শিশু অধিকার ইউনিট, আসক

প্রকাশক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৬
দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০১৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণে
মাহফুজুর রহমান, আইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রশাসন ইউনিট, আসক

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজুর রহমান, আইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রশাসন ইউনিট, আসক

উপকরণ প্রণয়নে
সাজ্জিদ আহমেদ, সিনিয়র প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ ইউনিট, আসক

চিত্রাংকন
নাবিলা ইকরাম, সি. আর্টিস্ট, শিশু অধিকার ইউনিট, আসক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই নির্দেশিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর বিভিন্ন ইউনিট বিশেষ করে প্রশিক্ষন ইউনিট, কাউন্সেলিং ইউনিট, প্রশাসন ইউনিটের কম্পিউটার সেকশন সর্বাত্নক সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়া পুরো নির্দেশিকাটি প্রণয়নে যে সকল কর্মীগণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত থেকে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, শিশু অধিকার ইউনিট এর পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

মোঃ মকছুদ মালেক
উপপরিচালক, শিশু অধিকার ইউনিট
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
১৯ ডিসেম্বর'২০১৬

সূচি

মুখবন্ধ- দ্বিতীয় সংস্করণ ৫
মুখবন্ধ- প্রথম প্রকাশ ৬
অনলাইনের সঙ্গে যুক্ত শিশুরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে ৯
অনলাইনের সঙ্গে যুক্ত না থাকা শিশুরা কীভাবে পিছিয়ে পড়ছে ১০
উদ্দেশ্য ১১
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ১১
কেস স্টাডি ১২
যৌন নির্যাতন কী? ২২
অনলাইন শিশু যৌন নির্যাতন এবং যৌন শোষণ কী? ২৩
অনলাইনে শিশু নির্যাতনের ধরন ২৪
অনলাইনে শিশু নির্যাতনের মাধ্যমগুলো কী কী? ২৬
যৌন নির্যাতনের শিকার হলে কেন শেয়ারিং প্রয়োজন? ২৭
সামাজিক ট্যাবো ২৮
কারা এবং কীভাবে শিশুদের অনলাইনে যৌন নির্যাতন করে? ২৯
অনলাইনে নির্যাতন থেকে সুরক্ষার উপায় কী? ৩০
ডিজিটাল কোনো বিষয় প্রমাণ করতে গেলে কী কী বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন? ৩১
অনলাইনে শিশু যৌন নির্যাতনের মাধ্যমসমূহ ৩২

ফেসবুক, মেসেঞ্জার এবং ইমো- এ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে প্রতারনা এবং প্রতারিত হওয়ার ধরন ৩৮
আইপি কিভাবে কাজ করে ৪১
ফিল্টারিং এবং ব্লকিং কি এবং এটা কিভাবে কাজ করে ৪২
এনক্রিপশন কি ৪৩
টর কি ৪৪
হ্যাস কি? ফটো ডিএনএ কি? কিভাবে এগুলো কাজ করে? ৪৫
ক্লাউড কম্পিউটার ৪৬
স্প্ল্যাশ পেজ কি? এটা কিভাবে কাজ করে? ৪৮
সন্তানের সাথে মা-বাবার সম্পর্ক কেমন হওয়া প্রয়োজন, অভিভাবকদের ভূমিকা ও করনীয় কি? ৫০
সন্তানদের মনিটরিং করার বিষয়ে বাবা-মায়ের ইতিবাচক করনীয় ৫৫
অনলাইনে যৌন নির্যাতন বিষয়ে জাতীয় আইনে কী কী প্রতিকার রয়েছে? ৫৭

মুখবন্ধ দ্বিতীয় সংস্করণ

নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতনতা বিষয়ক নির্দেশিকা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই নির্দেশিকাটিতে পুরনো অধ্যায় গুলোর পাশাপাশি কিছু অধ্যায় নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে যাতে করে শিক্ষার্থীরা নতুন বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পেরে সচেতনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়। তাছাড়া বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার বর্ননা রয়েছে যাতে করে সব বয়সী শিশুরা এই ঘটনা গুলো সম্পর্কে জানলে আরো বেশি সতর্কভাবে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতে সচেষ্ট হবে। এছাড়া প্রচলিত আইনগুলোতে শাস্তির পাশাপাশি আরো কি কি বিষয় রয়েছে সে সম্পর্কে ধারনা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। যাতে করে অভিভাবকগণ সন্তানের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করতে সচেষ্ট হন।

ধন্যবাদসহ

শীপা হাফিজা
নির্বাহী পরিচালক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতনতা বিষয়ক নির্দেশিকা

মুখবন্ধ প্রথম প্রকাশ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহজলভ্যতার সুবাদে আজ পুরো বিশ্বের মানুষ খুব সহজেই একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছে। নানা তথ্য, ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদান করছে। বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার বেড়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সব বয়সের, সব শ্রেণির মানুষের কাছে ইন্টারনেট সহজগম্যতা পেয়েছে। বিটিআরসি'র পরিসংখ্যান (২০১৫) অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ১৩০ মিলিয়ন মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। আগস্ট, ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ৬২ মিলিয়ন জনগণ বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। এর মধ্যে অধিকাংশ মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে, এ সংখ্যা প্রায় ৫৮ মিলিয়ন। বর্তমানে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে শিশু। এসব শিশুর মধ্যে কত শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে তার প্রকৃত পরিসংখ্যান না থাকলেও ধারণা করা যায় যে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু রয়েছে।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ইনস্টাগ্রামসহ নানা চ্যাট সাইটগুলো প্রধানত ফেসবুক এবং বিভিন্ন চ্যাটিং অ্যাপসগুলো আমাদের এখানে খবু জনপ্রিয়। প্রতিমুহূর্তে কোথায় কী ঘটছে তার সচিত্র তথ্য শেয়ার হয়ে যাচ্ছে ফেসবুকে, পৌঁছে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে। এসব মাধ্যম ব্যবহারের ফলে পরিচিত, অপরিচিত, বন্ধু থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজনের গণ্ডি পেরিয়ে সবাই একে অপরের খবু কাছাকাছি চলে আসছে। ভার্চুয়াল এই জগতে মনের ভাব প্রকাশের পাশাপাশি চিন্তাচেতনা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানাদিক বিচরণ করছে। বলা হয়ে থাকে, ইন্টারনেট হচ্ছে তথ্য ও নানামুখী জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইন্টারনেটের কল্যাণে পুরো বিশ্ব আজ একই সূতায় গেঁথে

আছে, কোথায় কী ঘটছে তা মুহূর্তের মধ্যে সবার হাতের মুঠোই পৌঁছে যাচ্ছে, তা সে বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন। এক ক্লিকের মাধ্যমে নানা তথ্য আমাদের সামনে ভেসে উঠছে। ইন্টারনেট আমাদের জন্য খুলে দিচ্ছে নানা সম্ভাবনার দুয়ার। কিন্তু একইসঙ্গে এটাও সত্য যে, ইন্টারনেটের ব্যবহার অনেক সময় বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে; বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের জন্য ইন্টারনেটের মায়াবী জগত নানা প্রলোভন ও হয়রানির উৎস হয়ে দাঁড়ায়, যা তাদের অনেকসময় বিপদগ্রস্থ করে আবার এর নানামুখী অপব্যবহার প্রায়শ বিপদজনক পরিণতি বয়ে আনে যা তাদের ব্যক্তিত্বে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমন অপব্যবহারের মধ্যে একটি হচ্ছে অনলাইনে শিশুদের যৌন শোষণ।

সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনে শিশুদের যৌন হয়রানি একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যদিও তা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার কারণে সেভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে না। মোবাইল ফোন বা অনলাইনে অনেক ধরনের হাতছানি আমাদের দেশের এই নিষ্পাপ শিশুদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা আমাদের জন্য বিপদজনক। ইন্টারনেট অপব্যবহার করে অনেকে আবার প্রতিশোধ স্পৃহা বা অন্যের ক্ষতি করার লক্ষ্যে অনেক ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও অনলাইনে ছেড়ে দিচ্ছে। এগুলো ব্যবহার করে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে। মোবাইলে অশ্লীল ভিডিওচিত্র ধারণ করে এবং তা এমএমএস করে শিশুদের প্রতারণা করছে। আসক কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত কয়েক বছরে পর্নোগ্রাফি, অশ্লীল ভিডিও, অশ্লীল ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে প্রায় ৫৬ জন শিশু যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৪ জন শিশু আত্মহত্যা করেছে। বিদ্যমান এসব ক্ষেত্রে অধিকাংশ মা-বাবা সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার ভয়ে কোনোরকম মামলা মোকদ্দমা করতে চান না। রঙিন এই জগতে পা ফেলে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে অনেক শিশু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

বিভিন্নরকম যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আমাদের দেশে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে; কিন্তু সামাজিক ভীতি সাধারণ মানুষকে এতটাই জিম্মি করে রেখেছে যে তারা ১৮ বছরের নিচে কোনো শিশুর সঙ্গে কোনো ব্যক্তি খারাপ উক্তি করলে, অশালীন কোনো আচরণ করলে শাস্তিস্বরূপ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫ লাখ টাকা জরিমানার বিধান থাকা সত্তেও কোনোরকম উদ্যোগ নিতে সাহস পায় না।

শিশুদের বিকাশে অনলাইনে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এর অপব্যবহারের দিকটি বিবেচনা করে এ সম্ভাবনার দুয়ার শিশুদের জন্য বন্ধ করে না দিয়ে বরং অনলাইনে শোষণমূলক বিষয় এবং উপকরণ হতে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত করে তুলতে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন। প্রত্যাশা করি, এ নির্দেশিকার মাধ্যমে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ৩টি শরিক সংস্থার (রাজশাহী, কক্সবাজার, সাতক্ষীরা) কর্ম এলাকায় বসবাসরত সমাজের সকল স্তরের শিশু নিরাপদ ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নিজেকে বিপদমুক্ত রাখবে। পাশাপাশি সমবয়সী অন্যদেরকেও সঠিক ইন্টারনেট ব্যবহারে উদ্যোগী করবে।

আশা করছি, এই নির্দেশিকাটি শিশুদের জ্ঞানবিস্তারে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং সহায়কের দক্ষতা, কৌশল ও যোগ্যতার ওপর এর ফলপ্রসূতা নির্ভর করবে। তাই এর যথাযথ ব্যবহারের ওপরই প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা নির্ভর করবে।

নির্দেশিকাটি প্রস্তুতির সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

ধন্যবাদসহ
মোঃ নূর খান
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

অনলাইনের সঙ্গে যুক্ত শিশুরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে–

- তথ্যের সম্ভারে বিচরণের সুযোগ থাকছে;
- তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে একে অপরকে সহযোগিতা করছে;
- বিশ্বের কখন কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য পাচ্ছে এবং সে অনুযায়ী নিজের বিচার-বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে পারছে;
- নিজের চিন্তা, জ্ঞানের পরিধি, সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত পাচ্ছে;
- ইউটিউব, ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হচ্ছে;
- অন্যদের সাথে ভাবের আদান প্রদান করতে পারছে, বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যতা সম্পর্কে জানতে পারছে যা তার চিন্তা চেতনার গভীরতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করছে;
- শিক্ষা উপকরণ, পাঠ্য বই, অনলাইন পত্রিকা, চিকিৎসা-স্বাস্থ্য, খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ইন্টারনেট থেকে পাচ্ছে;
- উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন দেশের স্কলারশীপ সম্পর্কে জানতে পারছে এবং নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারছে ।

অনলাইনের সঙ্গে যুক্ত না থাকা শিশুরা কীভাবে পিছিয়ে পড়ছে–

- অবাধ তথ্যের ভাণ্ডারে বিচরণ করতে পারছে না;
- তথ্য আদানপ্রদানের সহযোগিতা থেকে পিছিয়ে পড়ছে;
- উচ্চশিক্ষার সুযোগসমূহ সম্পর্কে জানতে পারছে না;
- নিজের চিন্তা, চেতনা এবং জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ থেকে যাচ্ছে;
- সৃষ্টিশীল কোনো কাজে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে পারছে না;
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও চর্চা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে না;
- সমসাময়িক অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ছে;

উদ্দেশ্য

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- শিশুরা নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ইন্টারনেটের নেতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।
- শিশুরা নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে উদ্যোগী হবে।
- কোনো শিশু ইন্টারনেটের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার চাইতে পারবে।

কেস স্টাডি

কেস স্টাডি ১

সৃষ্টিদের স্কুলে পরিবেশ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। সৃষ্টি খুব আগ্রহের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য নাম জমা দিয়ে এলো। কিন্তু সে যেভাবে রচনাটি সাজাতে চাচ্ছিল তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোথাও পাচ্ছিল না। তার মা তাকে গুগলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। গুগলের মাধ্যমে সে তার রচনার উপযোগী সব ধরনের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে স্কুলে জমা দিল। প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হলো। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে থাকা তার একজন শিক্ষক তাকে পরামর্শ দিল সে যেন রচনাটি ইন্টারনেটভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক রচনা প্রতিযোগিতায় জমা দেয়। সে তা করল এবং সেই প্রতিযোগিতায়ও সে প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকল। প্রতিযোগিতার পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র গেল।

কেস স্টাডি ২

নেহার বয়স বার বছর। সে একটি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তার কোনো ভাই-বোন নেই। তার বাবা-মার সাথে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বপরায়ণ নয়। বাবা-মা সবসময় তাকে কড়া শাসনে রাখে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া বা কোথাও ঘুরতে যেতে দেয় না। নিজেরাও তার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে খুব একটা যত্নশীল না। এসব কারণে নেহার মন সবসময় খারাপ থাকে। পড়াশোনার বাইরে তার কিছু করার নেই। একটা সময় সে বাবা-মা কে না জানিয়ে বিভিন্ন চ্যাট সাইটে অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে শুরু করে। সেখানে সে সবাইকে তার বয়স আঠারো বলে জানায়। একদিন ইন্টারনেটে তার সমবয়সী এক ছেলের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। সে ছেলে সবসময় তাকে সব ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। তার বাবা-মা তাকে বুঝতে না পারলেও সে বন্ধু তার সবকিছু বুঝতে পারে। নেহার পছন্দকে গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন সময় সে বন্ধু তাকে তার প্রিয় রেস্টুরেন্টগুলোতে খেতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। একটা পর্যায়ে তার খুব প্রিয়

একজন আন্তর্জাতিক সংগীত তারকা বাংলাদেশে কনসার্ট করতে আসে। বাবা-মাকে বললে বাবা-মা তাকে সেখানে নিতে রাজি হয় না; কিন্তু তার বন্ধু কনসার্টে যাওয়ার জন্য দুটো টিকেট ক্রয় করে। এদিকে নেহা তার বাবা-মাকে না জানিয়ে সন্ধ্যার পর সে কনসার্টে যায়। গিয়ে দেখে চারপাশে তার বয়সী কেউ নেই। নেহা ভাবে সে যে তার বয়স সম্পর্কে যে মিথ্যা কথা বলেছে তা বুঝে ফেলে বন্ধুটি কনসার্টে আসেনি। সে বন্ধুকে এসএমএস করে জানায় আমি দুঃখিত যে আমি তোমাকে আমার বয়স সম্পর্কে মিথ্যা বলেছি। সাথে সাথে বয়স্ক এক লোক যে এতোক্ষণ তার পাশে বসেছিল সামনে এসে বলে তুমি যেমনই হও না কেন তুমি আমার বন্ধু। ঠিক যেমন আমি তোমার বন্ধু। নেহা ভয় পেয়ে যায় এতো বয়স্ক একজন মানুষকে দেখে। সে বুঝতে পারে সে প্রতারিত হয়েছে। এবং লোকটিকে তার মোটেও পছন্দ হয় না। লোকটির আচার-আচরণ দেখে তার ভয় হয় যে লোকটি তার ক্ষতি করতে পারে।

কেস স্টাডি ৩

মেয়েটির নাম সুহা (ছদ্মনাম), বয়স ২৯ বছর, মিরপুর এলাকায় থাকে। ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে তাদের বিয়ে হয়। প্রথম থেকে সব কিছুই ভাল ছিল কিন্তু সংসার জীবনে বছর ঘুরতেই মেয়েটি বুঝতে পারে যে তার স্বামীর একাধিক মেয়ের সাথে বিয়ের আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল এবং সেটা বিয়ের পরেও গোপনে চালিয়ে যাচ্ছে। সে তার স্বামীকে অনেক বার বোঝানোর চেষ্টা করেও পারেনি। অনেক বার বাবার বাসায় মেয়েটি চলে গিয়েছিল। দুই পক্ষের বসার পরে কিছু দিন ঠিকমত চলতে থাকে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের কোল জুড়ে একটা ফুটফুটে ছেলে সন্তান আসে। কিছুদিনের মধ্যে পুনরায় ছেলেটির অবৈধ সম্পর্কের কথা মেয়েটির কানে আসতে থাকে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক মান-অভিমান চলতে থাকে। অবশেষে ২০১৭ সালের এপ্রিলে তাদের তালাক হয়। কিছুদিন পরে সে খেয়াল করল যে বিভিন্ন অপরিচিত আইডি থেকে তার কাছে ফেসবুকে রিকুয়েস্ট আসে এবং সাথে মেসেঞ্জারে

খুব আপত্তিকর মেসেজ পাঠায়। মেয়েটি প্রথমত এগুলো পাত্তা দেয়নি। কিন্তু একদিন ১টা আইডি থেকে তার খুবই ব্যক্তিগত একটি ছবি আসে যেটি দেখে সে হতাশ হয়ে পড়ে। বৈবাহিক জীবনের সময়কার ছবি গুলো তার স্বামীর কাছে রয়েছে সেটা কিভাবে অন্য মানুষের কাছে গেল তার মাথায় নেই। মেয়েটি তথ্য পাওয়ার জন্য যে আইডিগুলো থেকে এ ধরনের ছবি পাঠাচ্ছিল সেসব আইডিতে চ্যাট করা শুরু করে। ৩ টি আইডিতে কৌশলে চ্যাট করার পর একজন স্বীকার করল যে মেয়েটির ব্যক্তিগত ছবি গুলো তার স্বামী তার বন্ধুদের দিয়েছে। এ কথা শুনে মেয়েটি সুইসাইড করার জন্য প্রস্তুত হল। অবশেষে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে মেয়েটির ভাই Crime Research and Analysis Foundation-CRAF এর ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করে। ক্রাফের লিগাল কনসালটেন্ট ঘটনা শুনে ভিক্টিমকে পর্ণোগ্রাফি কন্ট্রোল এক্ট ২০১২ এর ৮(২) ধারায় মামলা করার পরামর্শ দেন এবং স্থানীয় থানায় স্বামী এবং আরও ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ৮ দিনের মধ্যে তার স্বামীসহ আরও ৩ জন যাদেরকে তার স্ত্রীর ছবি দিয়েছিল এবং ব্লাকমেইল করতে বলেছিল সকলকে গ্রেফতার করা হয় ও সকল ডিভাইস জব্দ করা হয়। ৪ জনের ইলেকট্রিক ডিভাইস জব্দ করে ফরেন্সিক টেস্ট করা হয় এবং সকল প্রকার ছবি, ভিডিও ডিলিট করা হয়। সকল প্রকার তথ্য চার্জশিটে উল্লেখ করে আদালতে প্রেরন করা হয়। বর্তমানে ৪ জন জেলে রয়েছে। মামলাটি চলমান, সকল তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে সঠিক ভাবে প্রমান করা সম্ভব হলে তাদের সর্বোচ্চ ৫ বছরের জেল এবং ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

[বিঃদ্রঃ- অনেক কেস বর্তমানে আসে যেখানে স্বামী তালাকের পর আগের স্ত্রীর ছবি নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে, টাকা দাবি করে, হয়রানি করে, অনলাইনে ছবি ছেড়ে দেয় ইত্যাদি। তাই বিয়ের আগে বা পরে এমন কোন ছবি তোলা বা আদান প্রদান করা উচিত নয় যেটা ভবিষ্যতে বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে]

কেস স্টাডি ৪

মেয়েটির নাম রাফায়া সুলতানা (ছদ্মনাম) ১৯ বছর, চট্টগ্রামে থাকে। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় দুবাই প্রবাসী একটা ছেলের সাথে তার ফেসবুকে পরিচয় হয়। দুইজনই সামনা সামনি কেউ কাউকে দেখেনি বলে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ফেসবুক আর ভিডিও চ্যাট হত ইমোতে। মেয়েটির অনলাইন সম্পর্কে তেমন ধারনা ছিল না। পরিচয়ের সূত্র ধরে ছেলেটি কৌশলে তার ফোনে মেয়েটার ইমো এর কোড নিয়ে রাখে এবং সেই সাথে ফেসবুকের পাসওয়ার্ড ও জেনে নেয়। মেয়েটি ছেলেটিকে অনেক বেশি বিশ্বাস করত তার ফলে ছেলেটি যা বলত মেয়েটি তাই শুনত। যেভাবে মেয়েটিকে ইমোতে আসতে বলত ঠিক সেভাবেই আসত। এর মধ্যে গোপনে ছেলেটি তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ইমোতে যে সব ভিডিও চ্যাট হত তার সব ভিডিও করে রেখে দেয়। ২০১৭ সালে ছেলেটি দেশে আসলে মেয়েটির সাথে দেখা করে এবং নেতিবাচক আচরন করতে জোর করে। ছেলেটি তাদের মধ্যে যেসব ভিডিও চ্যাট হয়েছে তা মেয়েটির সামনে উপস্থাপন করে। মেয়েটি তার ভুল বুঝতে পারে এবং ছেলেটির কাছ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে আসে। ছেলেটি পুনরায় দুবাই ফিরে গিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে, দিনের পর দিন মেয়েটি কাউকে কিছু না বলে অসহায় হয়ে পড়ে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে আবার দেশে এসে মেয়েটির কাছে টাকা দাবি করে এবং হুমকি প্রদান করে যে টাকা না দিলে ছেলেটির কাছে থাকা মেয়েটির কিছু ভিডিও অনলাইনে ছেড়ে দিবে। মেয়েটি কোন উপায় না দেখে তার বিয়ের জন্য বানানো একটা ৮ আনা ওজনের চেন বিক্রয় করে ছেলেটিকে দেয়। এতে ছেলেটির চাহিদা আরো বেড়ে যায়। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনলাইনে মেয়েটির ভিডিও ছেড়ে দিবে বলে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে এবং হুমকি দেয়। মেয়েটি টাকা দিতে অস্বীকার করলে ছেলেটি তার ভিডিও ৩ টা খারাপ সাইটে আপলোড করে এবং মেয়েটির ফেসবুকের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে নিজের দখলে নিয়ে নেয়। ঘটনার ৩ দিনের মাথায় মেয়েটি বন্ধুদের মাধ্যমে তার

ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার খবর জানতে পারে। মেয়েটি বাঁচার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে এবং ২ বার সুইসাইড করার চেষ্টা করে। ঘটনাটি পরিবার থেকে জানতে পেরে মেয়ের বড় বোন আইনগত ব্যবস্থা নেয় এবং ছেলেটিকে গ্রেফতারও করা হয়। অনলাইনে মেয়েটির যে ভিডিও গুলো ইতোমধ্যে আপলোড হয়েছে পুলিশ ছেলেটিকে দিয়ে মুছাতে পারছে না। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে মেয়ের বড় বোন Crime Research and Analysis Foundation-CRAF এর ফেসবুক পেইজে যোগাযোগ করেন। ক্রাফের টেকনিক্যাল টিম প্রথমে মেয়েটির একটা ফেক ফেসবুক একাউন্ট ফেসবুক থেকে মুছে দেয় এবং তার হ্যাক একাউন্টটি রিকভার করে। ক্রাফের আইন উপদেষ্টা এবং আরো ২ জন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট নিয়ে টিম গঠন করা হয় যারা ৩ টা ওয়েবসাইট থেকে মেয়েটির ভিডিও ডিলিট করার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন এবং ৩টি সাইটের মধ্যে ১টির সার্ভার থেকে সমস্ত খারাপ ভিডিও ডিলিট করতে সক্ষম হন এবং বাকি ২ টা সাইটের এক্সেস পাওয়া না গেলেও ছেলেটি ভিডিও যে সার্ভারে সংরক্ষন করতো সেটা ডাউন করে দেওয়া হয়। ফলে কেউ আর সে ভিডিওতে ক্লিক করলেও কোন ভিডিও দেখতে পায়না। মেয়েটি এখন ভাল আছে এবং মামলাটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

[সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন কোন অবস্থাতেই অনলাইনে কারো সামনে এমন ভাবে আসা উচিত নয় যা পরবর্তী সময়ে কোন মেয়ের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। কারণ অপর প্রান্তের মানুষটা সব কিছু রেকর্ড করছে কিনা সেটা সবাই বুঝতে পারে না]

কেস স্টাডি ৫

মেয়েটির নাম নুসরাত (ছদ্মনাম), ২৮ বছর, কুমিল্লা সদরে থাকে। ২০১২ সালে তুর্কি প্রবাসী ছেলের সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের ৩ বছরের একটা মেয়েও আছে। স্বামী দেশের বাইরে থাকায় তারা দিনে দুই থেকে তিনবার ইমোতে কথা বলতো। সব কিছুই ঠিকমত চলছিল। হঠাৎ একদিন একটা ইমো নাম্বার থেকে তাদের দুজনের কিছু ব্যক্তিগত ছবি যেগুলো মেয়েটি কয়েকমাস আগে তার স্বামীকে পাঠিয়েছিল শুধুমাত্র তাদের দুজনের কাছে রয়েছে, সেই ছবিগুলো থেকে কয়েকটি ছবি মেয়েটির স্বামীর কাছে তৃতীয় কোন ব্যক্তি পাঠায় এবং সেই নাম্বার থেকে মেয়েটির স্বামীর কাছে ২ লক্ষ টাকা দাবি করে ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করে নতুবা তাদের ব্যক্তিগত ছবিগুলো অনলাইনে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি প্রদান করে। মেয়েটির স্বামী দেশের বাইরে থেকে এ অবস্থা দেখে পুনরায় ১৫ দিনের মধ্যে দেশে চলে আসে এবং একটি সাইবার ক্রাইমের মামলা করে ও তদন্তে নামে পুলিশ। ইমোতে কথা বলা মোবাইল নাম্বার এবং কিছু কিছু তথ্যের ভিত্তিতে তৃতীয় লোকটিকে পুলিশ আটক করে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা অফিসিয়ালি Crime Research and Analysis Foundation-CRAF এর টেকনিক্যাল টিমের উপর ফরেনসিক টেস্টের দায়িত্ব দেন। তদন্ত করে জানা যায়, একটি ভাইরাস লিঙ্কে ক্লিক করায় মেয়েটির ডিভাইসের এক্সেস হ্যাকারের কাছে চলে যায়। সে সেখান থেকে ইমো এর কোড নিয়ে তাদের ইমো নিয়ন্ত্রন করে এবং তাদের পাঠানো সমস্ত ছবি সে সেভ করে নেয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুরোধে হ্যাকারের ফোন থেকে সে সব ছবি ডিলিট করা হয় এবং ফরেনসিক রিপোর্ট পাঠানো হয় আদালতে। ক্রাফের ফরেনসিক এক্সপার্ট তার ফোন থেকে সমস্ত ভাইরাস এবং কি-লগার ভাইরাস রিমুভ করতে সক্ষম হয়। মামলাটি এখন সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। এই ধরনের হ্যাকিং এর অপরাধের জন্য ছেলেটির জরিমানাসহ ৭-১৪ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

[যতগুলো মেসেঞ্জার বর্তমানে সব থেকে বেশি ব্যাবহার হয় তার মধ্যে ইমো একটি। কিন্তু এটির সিকুইরিটি লেভেল অনেক কম। কেউ আপনার ফোন নিয়ে কোড নিয়ে নিলে আপনাদের পাঠানো সমস্ত তথ্য সে দেখতে পাবে এবং আপনি চাইলেও বুঝতে পারবেন না বা তার একাউন্ট ডিলিট করতে পারবেন না। সে দিক থেকে Whatsapp অনেক সিকিউরড, কারণ কেউ কোড নিলে আপনারটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে অফ হয়ে যাবে এবং সব ডাটা ইনক্রিপটেড ফলে আপনি বুঝতে পারবেন কেউ এটা ব্যবহার করছে। আর সবশেষে কোন একান্ত ব্যক্তিগত ছবি আদান প্রদান না করাই উত্তম।]

কেস স্টাডি ৬

মেয়েটির নাম মিতা চৌধুরী (ছদ্ম নাম), বয়স ২১, ঢাকার একটি স্বনামধন্য কলেজের ১ম বর্ষে পড়া অবস্থায় মালয়েশিয়া প্রবাসী একটা ছেলের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয়। কিছুদিনের মধ্যে পরিচয় থেকে সম্পর্কে পরিনত হয় যা শুরু থেকে ভালই যাচ্ছিল। কলেজে ২য় বর্ষে ওঠার পর পরিবার থেকে বিভিন্ন জায়গায় তার জন্য ছেলে দেখা হচ্ছিল। মেয়েটি সব কথা ছেলেটিকে বলে এবং ছেলের পরিবার থেকে মেয়ের পরিবারে প্রস্তাব পাঠাতে অনুরোধ করে। ছেলেটি প্রথম থেকেই বিয়ে করতে পারবে না বলে মেয়েটিকে সরাসরি জানিয়ে দেয়। মেয়েটি কোন উপায় না দেখে তার পরিবারে বিয়েতে সম্মতি আছে বলে জানিয়ে দেয় এবং অন্য জায়গায় মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন মেয়েটিকে তার এক বান্ধবি জানায়, কেউ একজন মেয়েটির নামে ২ টা ফেক একাউন্ট ফেসবুকে খুলেছে যেখানে মেয়েটির নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার সব কিছু উল্লেখ করা হয়েছে এবং

সরাসরি খারাপ কিছু করার জন্য নিচে মোবাইল নাম্বার দিয়েছে এবং বিভিন্ন গ্রুপে মেয়েটির ছবি শেয়ার করেছে। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি তার স্বামীকে জানায়। মেয়েটির স্বামী কোন উপায় না দেখে অবশেষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর ৫৭(২) ধারা অনুযায়ী একটি মামলা দায়ের করে। পুলিশের পক্ষ থেকে Crime Research and Analysis Foundation-CRAF এর কর্মীদেরকে অপরাধীর কিছু তথ্য বের করে দেয়ার জন্য অফিসিয়ালি নির্দেশ দেয়া হয়। ফরেনসিক টেস্ট করে জানা যায় যে, এই ২ টা একাউন্টই মালয়েশিয়া থেকে চালানো হচ্ছে। পুলিশের কাছে রিপোর্ট পাঠালে পুলিশ মেয়েটির কাছে থেকে যাবতীয় তথ্য নিয়ে উক্ত অপরাধীর বিরুদ্ধে চার্জশিট আদালতে পেশ করে এবং ক্রাফের আইন উপদেষ্টাকে ২টি ফেক একাউন্ট যেখান থেকে মেয়েটির মান সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে সেগুলো বন্ধ করে দিতে বলা হয়। ক্রাফের আইন উপদেষ্টাসহ আরো ৩ জন সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিষ্ট একসাথে ফেসবুক থেকে সেই ২টি ফেক একাউন্ট মুছে দিতে সক্ষম হন। বর্তমানে কেসটি সাইবার ট্রাইবুনালে চলমান আছে। সঠিক ভাবে প্রমান হলে ছেলেটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর আওতায় ৭ থেকে ১৪ বছরের জেল হতে পারে।

[কোন ব্যক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর ৫৭(২) ধারা অনুযায়ী ওয়েবসাইট বা কোন ইলেকট্রিক মাধ্যমে মিথ্যা, অশ্লীল, মানহানিকর কিছু পোস্ট বা প্রকাশ করলে শাস্তি হতে পারে সর্বনিম্ন সাত বছর থেকে সর্বোচ্চ ১৪ পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সেই সাথে ১ কোটি টাকা জরিমানা। তাই অনলাইনে কারো বিরুদ্ধে কিছু পোস্ট দেওয়ার আগে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত]

কেস স্টাডি ৭

মেয়েটির নাম মিথিলা (ছদ্মনাম), সদ্য এ লেভেল পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। শখের বসে মাঝে মাঝে মডেলিং করে। হঠাৎ একদিন তার ফেসবুক, জিমেইল, টুইটার সব একাউন্ট একসাথে হ্যাক হয়। মেয়েটি যে ফোনসেট থেকে মেসেজ করতো তার স্ক্রিনশট ও ফেসবুকে প্রকাশ করতে শুরু করে। এ ঘটনার দিন রাতেই তার এক বান্ধবি Crime Research and Analysis Foundation-CRAF এর কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে এবং স্থানীয় থানায় একটা সাধারন ডাইরি করে। CRAF এর কর্মী মেয়েটির ডিভাইস ফরেনসিক করার জন্য অফিসিয়ালি মেয়েটিকে ডেকে পাঠায়। ডিভাইস ফরেনসিক টেস্ট করে বের হয়ে আসে ভয়াবহ সব তথ্য। হ্যাকার মেয়েটির ফেসবুক সহ যাবতীয় আইডি হ্যাক করে মেয়েটির ফোন সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রনে করে নেয়। মেয়েটি কি করে, কার সাথে চ্যাট করে সব কিছু হ্যাকার দেখতে পায়। ফরেনসিক রিপোর্টে জানা যায়, মেয়েটির ফেসবুক আইডি একটি ম্যালওয়ার দ্বারা ইঞ্জেক্ট হয় যেটা ওয়াইফাই দ্বারা ছড়িয়ে যায়। মেয়েটি যেখানে মডেলিং করতে গিয়েছিল সেখানকার ওয়াইফাইতে মেয়েটির ডিভাইস কানেক্ট করার পর হ্যাকার একটি ম্যালওয়ার পাঠায় যেটা ক্লিক করার সাথে সাথে মেয়েটির ফোনের সমস্ত নিয়ন্ত্রন হ্যাকারের কাছে চলে যায়।

ক্রাফের ফরেনসিক এক্সপার্ট এর সহায়তায় মেয়েটির ডিভাইস থেকে সমস্ত ম্যালওয়ার মুছে ফেলা হয় এবং তার সমস্ত হ্যাকড একাউন্ট গুলো রিকভার করা হয়।

[পাবলিক ওয়াফাই তে কেউ যদি ডিভাইস কানেক্ট করে তাহলে ওই একই নেটওয়ার্কে একজন হ্যাকার কানেক্ট করে অন্য সবার ফোনে কে কি টাইপ করছে, কোন সাইটে প্রবেশ করছে, এমন কি তার ফোনের সমস্ত তথ্য বের করে

আনতে পারে। স্পেশাল কিছু ম্যালওয়ার ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে ফোনের সমস্ত আপডেট, লোকেশন ও হ্যাকার পেতে পারে। তাই পাবলিক ওয়াইফাই ব্যাবহার থেকে দূরে থাকাই ভাল। আর খুব প্রয়োজন হলে কানেক্ট করার পর কোন ভি.পি.এন সফটওয়্যার দিয়ে নিজের আইপি পরিবর্তন করে তারপর ইন্টারনেট ব্যবহার করা ভাল।]

অনলাইনে কিছু তথ্য রাখলে গোপন নিরাপদ হবে আমার ব্যক্তিগত জীবন

অনলাইনে শেয়ার করা যাবে না-

নাম, জন্ম তারিখ, ব্যক্তিগত ছবি, ফোন নম্বর, ইমেইল এড্রেস, ঠিকানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, ইমেইল- ফেসবুক ইত্যাদির পাসওয়ার্ড

কারণ- সাইবার অপরাধী এসব তথ্য ব্যবহার করে আমাদের ক্ষতি করতে পারে

যৌন নির্যাতন কী?

বর্তমান সময়ে যৌন নির্যাতনের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই সংবাদ মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে। যৌন নির্যাতন বলতে যে কোনো ধরনের যৌনতা প্রকাশের আচরণ বা যৌন সুবিধা নেওয়ার ইচ্ছাকে বোঝানো হয় যা মৌখিক বা শারীরিক দুটোই হতে পারে।

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যে কোনো ধরনের যৌন কামনা নির্দেশক আচরণ (প্রকাশ্য বা ইঙ্গিতপূর্ণ), অশালীন (খারাপ ভাষা ব্যবহার ও গালি) চিঠিপত্র, অশালীন দৃষ্টি, মন্তব্য এবং অপরিচিত সাবালক নারীকে সুন্দরী বলে সম্বোধন করলে তা আদালতের কাছে যৌন হয়রানি বলে বিবেচিত হবে।

একইভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত, ২০০৩) ধারা ১০-এ বলা হয়েছে–

যদি কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন।

শিশু যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেও তা অভিন্ন। যখন কেউ কোনো শিশুর সাথে যৌন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয় তখন যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এ ধরনের যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো সব সময় একপক্ষীয় হয়। যেখানে শিশুর কোনো ভূমিকা থাকে না। কারণ বিষয়টি বোঝার জন্য যে সক্ষমতা প্রয়োজন তা শিশুটির নেই বা মানসিকভাবে সে প্রস্তুতও থাকে না।

সাধারণত শিশু ধর্ষণ, শিশুর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা এবং শিশুর সাথে দৈহিক মিলনকে শিশু যৌন নির্যাতন বলে। এছাড়াও অন্যান্য শারীরিক কার্যক্রমও যৌন নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশুদের সাথে যৌন কার্যকলাপ দেখা, যৌন নির্যাতনে লিপ্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং অবৈধ যৌন সামগ্রী দেখানো ও তা প্রকাশ করা।

অনলাইন শিশু যৌন নির্যাতন এবং যৌন শোষণ কী?

অনলাইন যৌন হয়রানি বা নির্যাতন বলতে ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোন শিশুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাকে অশালীন কথা, বার্তা, ছবি কিংবা ভিডিও প্রদান করা, আবেগীয় সম্পর্ক স্থাপন করে নানা যৌনকর্মে নিয়োজিত করা, শিশুর বিবিধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিংবা অর্থ বা কোনো উপহার প্রদানের মাধ্যমে তাকে নানা যৌনতামূলক অঙ্গভঙ্গি কিংবা আচরণে প্ররোচিত করা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়।

অধিকাংশ সময় অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা এই রকম হয়রানি সংঘটিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিচিতজনরাই এরূপ হয়রানি করে থাকে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোনো শিশুকে অশালীন কথা, ছবি, কিংবা ভিডিও প্রদান করাই হচ্ছে অনলাইনে শিশু যৌন নির্যাতন।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কিছু স্থিরচিত্র কিংবা ভিডিও ধারণ করে অনলাইন জগতে ছেড়ে দেওয়া হয়। একইভাবে এসকল ধারণকৃত ভিডিও সংরক্ষণ করে ভুক্তভোগীকে ভয় দেখিয়ে পুনরায় তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য করা হয়। এছাড়াও অনেক সময় ধারণকৃত ভিডিও বাণিজ্যিকভাবে ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এভাবে শিশুরা অনলাইনে যৌন শোষণের শিকার হয়ে থাকে।

অনলাইনে শিশু নির্যাতনের ধরন

বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (যেমন– কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাব) মাধ্যমে নানাভাবে শিশু নির্যাতনের শিকার হতে পারে। যেমন–

- ওয়েবক্যামের মাধ্যমে অনলাইনে ধারণকৃত শিশুর যৌনচিত্র প্রচার এবং তার বিনিময়ে অর্থ প্রদান করার মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০১৩-২০১৪ সালে ফিলিপাইনে অভিভাককরা বাণিজ্যিকভাবে তাদের শিশুদের ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে অনলাইনে যৌন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এবং এই যৌনচিত্র অনলাইনের মাধ্যমে যারা দেখেছিল, তাদের প্রদান করা অর্থ ঐ শিশুর অভিভাবক এবং মধ্যস্থতাকারী গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে শিশুর অভিভাবকদের ধারণা ছিল এটি তাদের শিশুদের ওপর কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না, কেন না তারা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না।

- সাইবার হয়রানির (Cyber bullying) মাধ্যমেও শিশু নির্যাতনের শিকার হতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে অন্যজনকে হুমকি বা ভীতিমূলক বার্তা প্রদান করে তখন তাকে সাইবার হয়রানি বলে। এর শিকার শিশুও হতে পারে।

- অনেক সময় শিশুরা কোনো বল প্রয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় যৌন উত্তেজনামলূ ক ছবি বা ভিডিও ধারণ করে থাকে তাকে সেক্সটিং বলে। এই ছবিগুলো তারা তাদের ছেলে বা মেয়ে বন্ধুকে পাঠায়। কিন্তু

কিছু দিন পর তাদের সম্পর্ক ভেঙে গেলে এই ছবিগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তে পারে। শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিরা তা সংগ্রহ ও বিক্রি করতে পারে, যা শিশুদের বতর্মান ও ভবিষ্যৎ বিকাশের ক্ষেত্রে ভয়াবহ হুমকি হিসেবে দেখা দেবে। আমাদের দেশে আমরা প্রায়শ দেখি এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

- শিশুরা তাদের যৌন উসকানিমূলক ছবির কারণে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নির্যাতনকারীরা তাদের এই ছবিগুলো ঐ শিশুর বন্ধু, পরিবার বা বৃহৎ পরিসরে বিতরণ করার হুমকি দিয়ে তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে বাধ্য করতে পারে। এই ধরনের আচরণকে সেক্সটরশন বলা হয়।

- গ্রুমিং-এর মাধ্যমেও অনলাইনে শিশু নির্যাতন হতে পারে। গ্রুমিং হলো যখন কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বন্ধুত্বপূর্ণ উৎসাহব্যঞ্জক অথবা কূটকৌশলের মাধ্যমে কোনো শিশুকে যৌন কাযর্ক লাপে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে। এ ধরনের অনেক গ্রুমিং-এর ঘটনা ইন্টারনেট বিশেষত (ফেসবুক)-এর মাধ্যমে তৈরি হয়। পরে তারা সরাসরি দেখা করতে আসে এবং নানা কৌশলে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে। গ্রুমিং-এর অংশ হিসেবে নির্যাতনকারীরা শিশুদের যৌনতা সম্পর্কিত কোনো ছবি বা যৌনসামগ্রী দেখতে প্ররোচিত করে। যৌনতাকে সাধারণ বিষয় হিসেবে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

- অনেক সময় শিশুকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে অথবা অর্থ উপহার, খাদ্য, চাকরি- ইত্যাদি দেওয়ার মাধ্যমে তাকে যৌন শোষণ করতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য শিশুর যৌন শোষণের ভিডিও বা ছবির দৃশ্য দেখাতেও অপরাধী বাধ্য করে থাকে। কোনো শিশু যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকৃতি জানালে অপরাধীরা শিশুকে অশ্লীল কথা বলে, অনেক ক্ষেত্রে তাকে বা তার পরিবারের সদস্যদের শারীরিক নির্যাতন করে তাকে যৌন কাজে যেতে বাধ্য করে।

- অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের (ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি) দ্বারাও শিশু নির্যাতন ঘটতে পারে, যেমন কারো নামে ফেসবুকে মিথ্যা একাউন্ট খুলে তাকে নানাভাবে হয়রানি করা বা কারো একাউন্ট, পাসওয়ার্ড বা তথ্য হ্যাক করার দ্বারা হয়রানি করা। আবার অজ্ঞাত ব্যক্তির সাথে চ্যাটিং করার মধ্য দিয়ে শিশুরা অনলাইনে নির্যাতনের শিকার হতে পারে।

অনলাইনে শিশু নির্যাতনের মাধ্যমগুলো কী কী?

মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম অনলাইন নির্ভরশীল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসামগ্রী সহজলভ্য হওয়ায় আমরা

ছবিতে উল্লিখিত বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে থাকি। ফলে অনেক সময় নিজের অজান্তেই কিছু ভুল করে থাকি। যেমন: অনলাইনে যৌনতা সম্পর্কিত বই পাঠ, কাউকে ভয় দেখানো/হুমকি দেওয়া, আইডি হ্যাকিং করা, ভাইরাস ছড়ানো, ফাঁদে ফেলা, হয়রানি করে, পর্নোগ্রাফি তৈরি করা, পছন্দের বিষয় খুঁজতে গিয়ে কিছু নিষিদ্ধ সাইটে প্রবেশ করা এবং লোভ দেখিয়ে (আকর্ষণীয় ছবি, ওয়াল পেপার, আর্থিক অনুদান, চাকরি, লটারি পুরস্কার) বিভিন্ন লিংকে প্রবেশ করানো ইদ্যাদি।

যৌন নির্যাতনের শিকার হলে কেন শেয়ারিং প্রয়োজন?

অনলাইন বা সরাসরি যেকোন ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার হলে মানুষের ওপর চরম মানসিক আঘাত হানে। ফলে সে অবসাদে ভোগে। তাই এরূপ ঘটনা থেকে মুক্তির জন্য এবং মানসিক যন্ত্রণা লাঘবের জন্য বিষয়টি নিয়ে শেয়ারিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক একইভাবে বিষয়টি কোনো ব্যক্তির সাথে শেয়ার করা প্রয়োজন তা নির্বাচন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শেয়ার করার পূর্বে যার সাথে শেয়ার করা হবে সেই ব্যক্তি কতটা নিরাপদ তা ভালোভাবে বিবেচনা করে নেওয়া জরুরি। অন্যের সাথে নিজের যৌন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা কঠিন এবং খুবই সাহসী কাজ। চুপ করে থাকাটা ভয়ঙ্কর এবং নিরাময়ের পথে বাঁধা তৈরি করে। একইভাবে কোনো শিশুর সাথে ঘটে যাওয়া যৌন নির্যাতনও শেয়ার করা আবশ্যক। কেননা এরূপ যন্ত্রণার মধ্যে থাকলে তাদের পূর্ণ বিকাশে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া নিম্নোক্ত ক্ষেত্রেও তাদের সহযোগিতা করে–

- এটা নিজেকে রক্ষার প্রম পদক্ষেপ;
- নিজেকে নিরাপদ রাখে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে;
- নিজের কষ্ট, রাগ, ভয় থেকে তৈরি খারাপ অনুভূতিগুলো দূর হয়। সে নিজস্ব ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে পারে। আত্ম-সম্মানবোধ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে;

- ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে শারীরিক ও মানসিক প্রভাব পড়ে তার দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে;
- পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত মানসিক চাপ এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করে;
- অন্যের সাথে নেতিবাচক অনুভূতিগুলো শেয়ার করার মাধ্যমে সে নিজের সম্পর্কে সচেতন হয় যা তাকে ঘটনার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে;
- পরিবারের অন্যরা সচেতন হতে পারে।

সামাজিক ট্যাবো

ট্যাবো হচ্ছে সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কিছু বিষয় যার ভিত্তি কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও প্রচলিত বিশ্বাস, যেগুলো সত্য নাও হতে পারে। শিশু যৌন নির্যাতন নিয়ে আমাদের সমাজে বেশ কিছু সামাজিক ট্যাবো রয়েছে। ট্যাবো সমাজে যৌন নির্যাতন প্রতিহত করার পথে বাধা তৈরী করে। প্রচলিত ট্যাবোগুলো হলো–

কারা এবং কীভাবে শিশুদের অনলাইনে যৌন নির্যাতন করে?

আত্মীয়, অনাত্মীয় যে কোনো ব্যক্তিই শিশু নির্যাতনকারী হতে পারে। শিশু, কিশোর, প্রাপ্তবয়স্ক এমনকি বয়স্ক ব্যক্তিও শিশু নির্যাতনকারী হতে পারে। এদের মধ্যে সহপাঠী, খেলার সাথী, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্তা ব্যক্তিগণ, ধর্মীয় গুরু, প্রতিবেশী, কর্মস্থলে উর্ধ্বতন ব্যক্তি যে কেউই হতে পারে। এছাড়া মানসিকভাবে অসুস্থ এক ধরনের ব্যক্তি আছেন যারা শিশুদের প্রতি যৌন আগ্রহ বোধ করে, তারাও বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্তভাবে যৌন নির্যাতন করে থাকে–

- ইন্টারনেটে (ফেসবুক, টুইটার) ভালো ব্যবহার করে ও অমায়িক আচরণের মাধ্যমে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়ে তোলে
- অনলাইনে কোনো কিছুর প্রলোভন দেখিয়ে যেমন: উপহার, টাকা, চকলেট ইত্যাদি;
- নতুন কোনো সিনেমা দেখানোর বাহানায় পর্নোগ্রাফি দেখিয়ে;
- ফাঁদে ফেলে নির্যাতন করে যেমন: কাজ দিবে বলে;
- অনলাইনে ভিডিও শেয়ারিং করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চেনানোর মাধ্যমে;
- আক্রমণকারী নিজের যৌনাঙ্গ দেখানোর মাধ্যমে নির্যাতন করে; এবং
- ফোন, সামাজিক বিভিনড়ব মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিনড়ব যৌন বিষয় নিয়ে কথা বলে, ছবি শেয়ার করে

অনলাইনে নির্যাতন থেকে সুরক্ষার উপায় কী?

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনমান যেমন সহজ হয়েছে তেমনিভাবে নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। প্রযুক্তির বিষয়ের সাথে বেশি জড়িত থাকে শিশু ও কিশোর-কিশোরী। তারা বেশির ভাগ সময়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও গেমস সাইটগুলোতে প্রবেশ করে। তাই নিরাপদে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে–

অনলাইনে নির্যাতন থেকে সুরক্ষার উপায়

- কম্পিউটারে ভাইরাস গার্ড রাখা
- নিরাপদ পাসওয়ার্ড দেয়া বিশেষ করে পাসওয়ার্ডের সাথে কমপক্ষে ১টি বিশেষ চিহ্ন (@, # ইত্যাদি) দেওয়া
- নিজের পাসওয়ার্ড অন্য কাউকে না দেওয়া
- নিরাপদ/নিরাপত্তামূলক সফটওয়ার ব্যবহার করা
- আর্থিক বা লটারি জেতার লোভ পরিহার করা
- অনলাইনে অপরিচিত কারো সাথে বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা
- শুধু শিক্ষামূলক ও নির্ভরযোগ্য সাইটগুলো ব্যবহার করা
- নিজের ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, ভিডিও চিত্র শেয়ার না করা
- যত কাছেরই হোক না কেন, কারো অনুরোধে ওয়েব ক্যামেরা বা মোবাইল ফোনের ক্যামেরার সামনে কোন ধরনের শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গি কিংবা অঙ্গ প্রদর্শন না করা।
- অনলাইনে কেউ উত্ত্যক্ত করলে, সন্দেহজনক আচরণ করলে তা মা-বাবাকে বলা
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় নতুন অপশন এলে ভেবে চিন্তে সেগুলোতে প্রবেশ করা
- যে সকল গেমস ইন্টারনেট অপশন ছাড়াই খেলা যায়, সেগুলো খেলার সময় ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে রাখা
- মা- বাবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা যাতে তাদের সাথে সবকিছু শেয়ার করা যায় এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা পাওয়া যায়
- ব্রাউজারের কিছু অপশন প্রয়োজনে নিষ্ক্রিয়/সক্রিয় করে রাখা; যেমন– Popup Block, Site Block ইত্যাদি;

ডিজিটাল কোনো বিষয় প্রমাণ করতে গেলে কী কী বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন?

যে কোনো অনলাইন মাধ্যম ব্যবহারের পর পরবর্তী সময়ে যে কোনো প্রয়োজনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে পারে–

- হার্ডকপি রাখতে হবে;
- স্ক্রিন শট প্রিন্ট রাখতে হবে;
- বিষয়গুলো সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে;
- বিভিন্ন ওয়েব অ্যাড্রেস, ফেসবুক আইডি, ইমেইল ও
- তারিখ সংরক্ষণ করতে হবে।

অনলাইনে শিশু যৌন নির্যাতন

বর্তমানে "অনলাইনে শিশু যৌন নির্যাতন" অন্যতম সমস্যা হিসেবে মহামারী আকার ধারন করেছে। বাংলাদেশে যে সকল প্রতিষ্ঠান অনলাইনে ঘটে যাওয়া সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছেন এবং পুলিশের যে সব বিভাগগুলো দায়িত্ব পালন করছে তাদের কাজের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একদিনে প্রায় ৩৫০-৪০০ জন শিশু সাইবার ক্রাইমের শিকার হচ্ছে। আর সব থেকে ভাবনার বিষয় হল সচেতনতা কিছুটা সৃষ্টি করা গেলেও কোন ভাবেই এটা কমানো যাচ্ছে না; অনেকে নিরবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। কোমলমতি শিশুদের নিরাপদ অনলাইনে বিচরন করার কৌশল না জানলে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে এবং আত্মহত্যার সংখ্যাও বেড়ে যাবে।

কত ধরনের অনলাইনে যৌন হয়রানী হতে পারে?

- ফেক আইডি
- হ্যাকিং এবং কন্টাকমেইল
- খারাপ ছবির মাধ্যমে প্রতিশোধ মূলক কন্টাকমেইল
- সাইবার বুলিং
- অনলাইনে মিথ্যা খবর প্রচার
- অনলাইনে হুমকি

ফেক আইডি: বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের অনেক দেশের ছেলে মেয়েরাই ভুয়া আইডির সমস্যায় পড়ে থাকে। ফেসবুকে বা সোশাল মিডিয়াতে কাউকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই ভুয়া আইডি অনেকে তৈরি করে। যে সব সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো অনলাইনে নির্যাতনের শিকার হওয়া সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। এর ফলে প্রতিদিন ভুয়া আইডি নিয়ে ৪৫০-৫০০ অভিযোগ জমা পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মেয়ের ছবি নিয়ে ভুয়া আইডি খুলে তার নামে আপত্তিকর ও মানহানিকর তথ্য প্রকাশ করে। এমন কি অনেক সময় মেয়েটির ছবি কেটে খারাপ নোংরা ছবিতে লাগিয়ে হয়রানি করে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতির ভয়াবহতা দিন দিন বেড়েই

চলেছে। কিন্তু বর্তমানে ভুয়া আইডি বন্ধ করে দেওয়া এমনকি আইনগত ব্যবস্থা নিলে কে বা কারা এই ধরনের কাজ করেছে তাকে ধরে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়।

এই ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য কিছু উপায় মানা যেতে পারে-

- ছবি পাবলিক ভাবে প্রকাশ না করে শুধুমাত্র বন্ধুকে নিজের ছবি পাঠানো
- প্রোফাইল ছবিতে ফটো গার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে
- অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে বন্ধুর তালিকায় কোন ভাবেই না রাখা
- অপরিচিত কাউকে ছবি আদান প্রদান না করা
- কারো ফেক আইডি হয়ে গেলে নিজের একাউন্ট থেকে সেই ভুয়া আইডিতে ঢুকে Give feedback or report this account> Pretendint to Be someone> me> send>Report Profile>{click on(I believe that this goes against Facebook's Community Standards)}> Submit Report> Done.
- সমস্যার সমাধান না হলে কোন কম্পিউটার থেকে ফেক আইডির লিংক সহ স্ক্রিনশট নিয়ে সেটা প্রিন্ট করে থানায় গিয়ে জিডি করা এবং সেটা ৯৯৯ সহ বাংলাদেশে যে সব প্রতিষ্ঠান এধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করে তাদেরকে জানালে তারা এটা সাইবার সিকিউরিটি টিম দিয়ে বন্ধ করে দিবে।

হ্যাকিং এবং কন্টাক্ট মেইল: অনলাইনে শিশুদের যৌন হয়রানির যে সব অভিযোগ বর্তমানে আসে তার মধ্যে হ্যাক করে বা তথ্য বের করে নিয়ে সেটা থেকে যৌন হয়রানির মাত্রা অনেক বেশি।

হ্যাকিং দুইভাবে হতে পারে-

- ফেসবুক বা সোশাল মিডিয়ার একাউন্ট হ্যাক করে তথ্য বের করে নেওয়া
- মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার হ্যাক করে তথ্য বা ছবি বের করে নেওয়া

ফেসবুক বা সোশাল মিডিয়ার একাউন্ট হ্যাক করে অনেক সময় নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত কথা এর স্ক্রিনশট বা ছবি, হ্যাকার নিয়ে নেয় এবং সেটা থেকে অনেক ভাবে যৌন নির্যাতন করে থাকে। যেমন: অনেক সময় হ্যাকাররা তাদেরকে খারাপ সম্পর্কের প্রস্তাব দেয়, আবার অনেক সময় যার একাউন্ট হ্যাক কওে তাকে আরো ছবি পাঠাতে জোর করে, সরাসরি সেসব ছবি অনলাইনে ছেড়ে দেয়, এবং সবশেষে টাকা দাবি করে।

ফেসবুক যাতে কেউ হ্যাক করতে না পারে সেজন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে-

- ফেসবুকে অবশ্যই Email ID এবং মোবাইল নম্বর যোগ করা
- Two- Factor authentication অবশ্যই অন করা
- Get alerts about unrecognized logins অবশ্যই অন রাখা
- ৫ জন Trusted Contact ফেসবুকে এড করে রাখা
- যে Email ফেসবুকে এড করা হবে সেটারও Second Step Verification অন করে রাখা

হ্যাক হয়ে গেলে ৭২ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই মেইল এ গিয়ে ফেসবুক থেকে যে ইমেইল আসবে সেটা ক্লিক করে ফেসবুক পুনরুদ্ধার করতে হয়। ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে গেলে থানায় জিডি করে ভোটার আইডি কার্ড বা পাসপোর্ট এর কপি দিয়ে ফেসবুকে সাবমিট করতে হয়। এটা নিজে না পারলে জিডি এর কপি এবং আইডি কার্ডের কপি যথাযথ প্রতিষ্ঠান বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে পাঠালে তারা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারে।

আর কেউ কন্টাক্টমেইল করার চেষ্টা করলে বা টাকা দাবি করলে যত দ্রুত সম্ভব আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সব কিছু জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করা। যেহেতু সকল নাম্বার বিস্তারিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে আছে তাই যে নাম্বার থেকে হয়রানী বা টাকা দাবি করছে তার বিস্তারিত বের করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

কেউ মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার হ্যাক করে হয়রানী করলে যত দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ইলেকট্রিক ডিভাইস ফরেনসিক করে অপরাধীকে খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়।

এই ধরনের হ্যাক থেকে বাঁচতে করনীয়-

- কারোর পাঠানো কোন ধরনের লিংকে না বুঝে ক্লিক না করা।
- কোন লিংক পেলে সেটাতে গিয়ে কোন লগিন না করা।
- প্রলোভন জাতীয় কোন কিছুতে অনলাইনে ক্লিক না করা।
- "ক্রাক ভার্সন" অনলাইন থেকে না নামানোই উত্তম।
- অপরিচিত কারো দেওয়া কোন ফাইলে ক্লিক না।

খারাপ ছবির মাধ্যমে প্রতিশোধ মূলক কন্টাক্টমেইল: অনলাইনে খারাপ ছবি দেখিয়ে কন্টাক্টমেইল বা টাকা আদায়ের পরিমান যেমন বাড়ছে তেমনি সাইবার কেসও বাড়ছে। এই ধরনের সমস্যা তিন ভাবে হতে পারে-

- বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড এর কাছে পূর্বে থেকে যাওয়া ছবি থেকে কন্টাক্টমেইল
- তালাকের পরে পূর্বের স্ত্রীর ছবি নিয়ে কন্টাক্টমেইল
- অপরিচিত কাউকে তার ছবি এডিট করে বা হ্যাক করে সে ছবি থেকে অনলাইনে কন্টাক্টমেইল।

এর মধ্যে সব থেকে বেশি হয় বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড সম্পর্কিত কন্টাক্টমেইল। সম্পর্ক থাকা কালীন একটা ছেলে মেয়ের মধ্যে যেসব ছবি আদান প্রদান হয় সেগুলো দিয়ে পরবর্তীতে কন্টাক্টমেইল এর শিকার হয়। আর এই ধরনের সমস্যায় পড়লে তারা বাসায় কাউকে জানাতে পারে না, কাউকে শেয়ার করতে পারে না। কন্টাক্টমেইল এর শিকার হয়ে অনেকে আত্মহত্যা করার ও উদ্যোগ নেয়। এভাবে সমস্যায় পড়লে শিশুরা অনেক সময় ভেঙে পড়ে। সুতরাং এভাবে ভেঙে না পড়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা বা বড় কাউকে জানিয়ে থানায় তার নামে জিডি করতে হবে। থানা থেকে যে ব্যক্তি মেয়েটিকে বিরক্ত করে তাকে বলে দিলে এই সমস্যাগুলো থেকে দ্রুত নিস্তার পাওয়া যায়।

অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর তালাকের পরে স্বামী বা স্ত্রী তাদের বিবাহিত জীবনের সেই সব ছবি ছড়িয়ে দেয় বা টাকা না দিলে পরিবারের সদস্যকে দিয়ে হুমকি দেয়ার কেস পাওয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করাই ভাল।

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল কোন অবস্থাতেই এমন কোন ছবি তোলা উচিৎ নয় যেটা ২য় ব্যক্তি দেখলে সমস্যা। কারন ছবি দিয়ে হয়রানি করার প্রবনতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছবি ডিলিট করে দেওয়ার মানসিকতা থাকলে এমন খারাপ ছবি তোলা উচিৎ নয়। কারন কিছু ফরেনসিক সরঞ্জাম দিয়ে ছবি শতবার ডিলিট করলেও সেটা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

আর অনলাইনে যদি অপরিচিত কেউ কন্টাক্টমেইল করে বা টাকা দাবি করে তাহলে তার ওই টাকা দাবি করে দেওয়া নাম্বারের বিরুদ্ধে জিডি করা ভাল। পুলিশের কাছে সকল নাম্বারের বিস্তারিত আছে। তদন্তের স্বার্থে সে তথ্য বের করলে অপরাধীকে সহজে ধরা সম্ভব।

সাইবার বুলিং: বর্তমান সোশাল মিডিয়ার কারনে অকারনে অনেক শিশু সাইবার বুলিং এর শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন ভাবে এই সমস্যা হতে পারে।

- কাউকে পছন্দ হল, তার ছবি অনলাইনে দিয়ে খারাপ কথা লেখা।
- লক্ষ লক্ষ মানুষের গ্রুপে কাউকে ছোট করে বা খারাপ ভাবে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ।
- কাউকে পছন্দ না হলে তার নামে খারাপ ভাষায় অনলাইনে কিছু লেখা।
- সরাসরি ছবি দিয়ে, মোবাইল নাম্বার, বাসার ঠিকানা দিয়ে তাকে সমাজের সামনে ছোট করা।

এ ধরনের কোন সমস্যায় পড়লে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর ৫৭(২) ধারায় তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তদন্তে অপরাধী বের হয়ে আসলে সাইবার আইন অনুযায়ী তার ৭-১৪ বছরের জেল সাথে সর্বোচ্চ ১ কোটি পর্যন্ত টাকা জরিমানা হতে পারে।

অনলাইনে মিথ্যা খবর প্রচার: অনলাইনে মিথ্যা খবর বা তথ্য প্রকাশ শুধু ফেসবুকে বা এই ধরনের মিডিয়াতে প্রচার হবে তা নয়। অনেক সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ও কোন শিশুর ছবি প্রদান করে একটি খারাপ খবর প্রচার করতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেয়েটির সাথে ওই খবরের কোন সম্পর্ক নেই। এসব অতিরঞ্জিত খবরে সামাজিকভাবে শিশুদের অনেক সমস্যা হয়ে থাকে ।

সমাধান: অনলাইনে এমন মিথ্যা খবর প্রচার করা হলে সেই সকল ওয়েবসাইট এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। যেমন ওয়েবসাইটেরে লিংক সহ জিডি বা মামলা করলে এই সাইট কার নামে ডোমেইন হোস্টিং নেওয়া, কার নামে রেজিস্ট্রি করা সব জানা যায়। এটা বের হয়ে গেলে কে উক্ত শিশুর নামে খারাপ ধরনের ছবি ছেড়েছে তাকে খুঁজে বের করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। ফেসবুকেও এই ধরনের ভুয়া খবর বের হলে সাইবার মামলা ও ফরেন্সিক টেস্ট এর মাধ্যমে কে করছে সেটা জানা যায়।

অনলাইনে হুমকি: বর্তমানে অনলাইনে শিশুরা না বুঝেই অনেক কিছুতে ক্লিক করছে যার ফলে অনেক বেশি হুমকির শিকার হচ্ছে। কেউ শিশুর কাছে টাকা দাবি করছে। কেউ বিভিন্ন ফাদে ফেলে খারাপ কিছু আদায় করছে। আর এ ধরনের সমস্যা হলে শিশুরা কি করতে হবে সেটা বুঝতে পারে না।

সমাধান: অনলাইনে হুমকি দিয়ে কেউ টাকা দাবি করলে যত দ্রুত সম্ভব সেই নাম্বার উল্লেখ করে থানায় জিডি করতে হবে। নাম্বারের বিস্তারিত পুলিশের কাছে থানায় দিলে তারা সহজে হুমকি কে দিচ্ছে সেটা জানতে পারবে। আর অন্য কোন ভাবে যদি তারা হুমকি দিয়ে থাকে এবং সেটা অনেক বেশি পরিমান সমস্যা সৃষ্টি করলে সেই আইডি এর লিংক সহ থানাতে সাইবার মামলা দায়ের করা যায়। সেক্ষেত্রে তদন্তে বের হয়ে আসে এবং সেই অপরাধী ও শাস্তি পায়।

ফেসবুক, মেসেঞ্জার এবং ইমো- এ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে প্রতারনা এবং প্রতারিত হওয়ার ধরন-

২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনামে জানা যায়, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মেয়েদের ৭৭ শতাংশই ফেসবুক কেন্দ্রিক সাইবার অপরাধের শিকার হয়। পাসওয়ার্ড হ্যাকিংয়ের শিকার হয় ১২ শতাংশ, ৪ শতাংশ ইমেইল ও এসএমএস হুমকি, ২ শতাংশ সাইবার পর্নোগ্রাফি এবং ৫ শতাংশ আইডেনটিটি থেফটের শিকার হয়। এ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে হ্যাকাররা বিভিন্ন বয়সী মেয়েদের হয়রানি করছে। আর তাই ধরনগুলো জানা খুব প্রয়োজন-

ফেসবুকের মাধ্যমে প্রতারনা: ফেসবুকের মাধ্যমে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি।

ফেসবুক এক্সেস প্রতারনা: এক জনের ফেসবুক অপর একজন এক্সেস নিয়ে প্রতারনা করতে পারে। বিভিন্ন ভাবে এই ফেসবুক এক্সেস নেওয়া সম্ভব। যেমন: পিশিং লিঙ্ক সেন্ড করে, তার জন্ম তারিখ জেনে ফেক আইডি সাবমিট করে, মালওয়ার লিঙ্ক দিয়ে, সিকিউরিটি কম দিয়ে।

পিশিং লিঙ্ক হল এমন একটা মাধ্যম যার মাধ্যমে কোন একজনকে দেখান হবে যে তার সামনে ফেসবুক বা জিমেইল এর অরিজিনাল পেজ। এসব পেজে নিজের আইডি-পাসওয়ার্ড দিলে হ্যাকার সেটা দেখতে পায়। এভাবে পাসওয়ার্ড নিয়ে সে একাউন্ট এ ঢুকে যেতে পারে।

এটা থেকে বাঁচার উপায় হল ফেসবুকের অরিজিনাল লিঙ্ক ছাড়া একই রকম অন্য সব পেজে পাসওয়ার্ড না দেওয়া।

২য় ফেক আইডি কার্ড সাবমিটের মাধ্যমে ফেসবুকে প্রতারণা করা হয়। ফেসবুকে অনেকেই তার জন্ম তারিখ, সাল শো করিয়ে রাখে। কোন হ্যাকার ব্যক্তির সবকিছু জেনে ফেক আইডি কার্ড সাবমিটের মাধ্যমে তার ফেসবুক নিয়ন্ত্রন করতে পারেন। এটা থেকে বাঁচার উপায় হল ব্যক্তিগত কোন তথ্য ফেসবুকে শেয়ার না করা।

মালওয়ার লিঙ্ক দিয়ে: এটা একটা ভাইরাস লিঙ্ক। এ ধরনের লিঙ্কে হ্যাকার ক্লিক করে ব্যক্তির সমস্ত একাউন্ট এমন কি ডিভাইস নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে নিতে পারে। এটা থেকে বাঁচার উপায় হল কারো দেওয়া লিঙ্কে সহজে না বুঝে ক্লিক না করা।

সিকিউরিটি কম দিয়ে: অনেক তার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড তার নিজের নাম, মোবাইল নাম্বার ইত্যাদি ফেসবুকে দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে হ্যাকার সহজে সেটা অনুমান করে একাউন্ট এক্সেস নিতে পারে। আবার অনেকে সেকেন্ড স্টেপ ভেরিফিকেশন আর ট্রাস্টেড কন্টাক্ট দেয় না। এটা থেকে বাঁচার উপায় হল পাসওয়ার্ড এর ভেতরে সংখ্যা, সাইন, বড়-ছোট হাতের লেখা ব্যাবহার করা। আর মোবাইলে সেকেন্ড স্টেপ সহ ট্রাস্টেড কন্টাক্ট অবশ্যই এড করা। আর নিজের ফোন অন্য কারো হাতে না দেওয়া নিরাপদ। কারন আপনার একাউন্টের কোড দিয়ে নিলে আপনার একাউন্ট বেহাত হতে পারে।

উপরে উল্লিখিত কোন একটি উপায়ে ফেসবুক বেহাত হয়ে গেলে হ্যাকার টাকা দাবি করতে পারে, অন্য কারো সাথে কথা বলে আসল ব্যক্তি সেজে টাকা চাইতে পারে, মেসেঞ্জার থেকে সমস্ত ছবি সংগ্রহ করে সেটা দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে ইত্যাদি।

অনেকে মেসেঞ্জারে অপরিচিত আইডি থেকে রিকুয়েস্ট গ্রহণ করে সেখান থেকেও প্রতারণা বা ব্ল্যাকমেইলের শিকার হতে পারে। তাই অপরিচিত মেসেজ রিকোয়েস্ট পরিহার করা উচিত।

অনলাইনে অনেক ভুয়া পেজ খুলে এটা ওটা বিক্রয় করার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে যেটা থেকে অনেকে প্রতারিত হয়ে থাকে। তাই অনলাইন থেকে কিছু কেনার আগে ভাল করে জেনে শুনে তারপর সেখান থেকে কেনা উত্তম।

ইমো: যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে যেসব মেসেঞ্জার বর্তমানে সব থেকে বেশি ব্যবহার হয় তার মধ্যে ইমো একটি। কিন্তু এটির সিকিউরিটি লেভেল অনেক কম। কেউ আপনার ফোন হাতে নিয়ে কোড নিয়ে নিলে আপনাদের

পাঠানো সমস্ত তথ্য সে দেখতে পাবে এবং আপনি চাইলেও বুঝতে পারবেন না বা তার একাউন্ট ডিলিট করতে পারবেন না। সে দিক থেকে Whatsapp অনেক সিকিউরড, কারন কেউ কোড নিলে আপনারটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে অফ হয়ে যাবে এবং সব ডাটা ইনক্রিপটেড ফলে আপনি বুঝতে পারবেন কেউ এটা ব্যবহার করছে। আর সবশেষে কোন একান্ত ব্যক্তিগত ছবি আদান প্রদান না করাই উত্তম।

ফেসবুক, হোয়াটস আপ, ইউটিউব, মেসেঞ্জার এবং ইমো থেকে ভাল এবং শিক্ষণীয় দিক-

ফেসবুক: ফেসবুকের বিভিন্ন শিক্ষণীয় পেজ আছে যেগুলাতে প্রতিনিয়ত ভাল ভাল শিক্ষণীয় তথ্য দিয়ে থাকে যেটা শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক ভাল। এছাড়াও ফেসবুক মেসেঞ্জারে ইনক্রিপটেড মেসেজ পাঠানো যায় সেটা ডিভাইস টু ডিভাইস ইনক্রিপটেড। যেটা এই দুই ব্যক্তির ডিভাইস ছাড়া কেউ কোনদিন পড়তে পারে না। এমন কি তার একাউন্ট হ্যাক হয়ে গেলেও ওই সকল ইনক্রিপটেড মেসেজ পড়া সম্ভব নয়।

হোয়াটস আপ: হোয়াটস আপ অনেক বেশি সিকিউরড। এটার মাধ্যমে পাঠানো সকল ডাটা ও ইনক্রিপটেড। তাই অন্য সকল মেসেঞ্জার থেকে এই মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান নিরাপদ।

ইউটিউব: ইউটিউব এর মাধ্যমে সকল কিছু দেখে শেখা সম্ভব। পড়াশোনার জন্য কোন কিছু বুঝতে না পারলে ইউটিউব এ সার্চ দিলে সেটার ভিডিও দেখে শেখা সম্ভব।

ইমো: ইমোর সিকিয়রিটি অনেক কম হলেও অনেক কম মেগাবাইটে এটার মাধ্যমে অনলাইনে কথা বলা সম্ভব। সেক্ষেত্রে স্কাইপ বা হোয়াটস আপ থেকে অনেক কম খরচে কথা বলা সম্ভব।

একাধিক সিম ব্যবহারের কুফলগুলো হল-

- আর্থিক ক্ষতি
- একসাথে ব্যবহারে নেটওয়ার্ক জনিত সমস্যা
- বার বার সিম পরিবর্তনে ডিভাইসের ক্ষতি।
- ২টি সিম একসাথে ফোনে ব্যাবহারে যে রেডিয়েশন তরঙ্গ নিঃসরণ হয় সেটা মস্তিস্কের জন্য ক্ষতিকর।
- ফোনের ব্যাটারি দ্রুত শেষ করে ফেলে।

আইপি কিভাবে কাজ করে

আইপি এড্রেস হল একটি ডিভাইসের সনাক্তকারি স্বাক্ষর, যেটা ডিভাইসকে সনাক্ত করতে, সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে, এবং অন্যান্য ডিভাইস যেটা অনলাইনে সংযুক্ত সেটা থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে। প্রতিটি ডিভাইস একটি ব্যক্তিগত আইপি এড্রেস থেকে আসে আর সেটা হোক কম্পিউটার, টেলিভিশন, গেমিং সরঞ্জাম। আইপি এড্রেস ২টি ডিভাইসের সংযুক্ত হতে অনুমতি দেয়। একইভাবে একজন ব্যক্তির একটি চিঠি পাঠাতে সক্ষম হওয়ার জন্য একটি পোস্ট ঠিকানা প্রয়োজন, একটি দূরবর্তী কম্পিউটারের একটি আইপি এড্রেস এটার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন। এইভাবে আইপি এড্রেস ব্যবহারকারীদের তথ্য সঠিক গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চিত করে। আইপি ডিভাইসটি কোথায় অবস্থিত এবং এটি কোন ইন্টারনেট সরবরাহ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রদান করে সে তথ্য প্রকাশ করে। এটি সমস্ত বিশ্বে একই ভাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রতিটি ডিভাইসের অবস্থান সম্পর্কে একই ভাবে কাজ করে।

আইপি এড্রেস ফরমেট-

একটি আইপি এড্রেসে কিছু সংখ্যা এবং বিন্দুর সেট থাকে। যেমন: ২০২.১৩৪.৯.১২০, ব্যবহৃত আইপি এড্রেস এর মধ্যে IP Version 6 অথবা IPv6 বিশ্বজুড়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

শিশুদের প্রতি অন্যায় আচরন সনাক্তকরণ এর জন্য আইপি এড্রেস এর ব্যবহার

শিশু যৌন অপরাধীরা যখন ইন্টারনেটে সংযুক্ত হয় তখন তারা একটি ডিভাইস ব্যবহার করে যার একটি আইপি এড্রেস আছে। এই আইপি এড্রেস ইন্টারনেটে কি কি করছে তার তথ্য রেখে যায়। অপরাধীকে ধরার জন্য কর্তৃপক্ষকে একটা সুযোগ করে দেয় এবং এর ফলে কর্তৃপক্ষ ডিভাইসটি কোথা থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে তা বলতে পারে। এভাবেই একজন ব্যক্তি যিনি উক্ত ডিভাইস ব্যবহার করে অপরাধ করছে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় আইন অনুযায়ী ব্যবহারকারীর সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে আইপি ঠিকানার লগ এবং তাদের

সার্ভারগুলিতে প্রবেশ করার জন্য ইন্টারনেট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত অনেক অপরাধীরা তাদের আইপি এড্রেস গোপন করে বা পরিবর্তন করে এই ধরনের অপরাধ করে থাকে। তার মধ্যে একটা পদ্ধতি হচ্ছে প্রক্সি সার্ভার। বরং তারা একটি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হলে প্রক্সি সার্ভারের মাধ্যমে সেখানে প্রবেশ করে। ফলে কোনো আইপি এড্রেসের নথি রাখে না। অন্য একটি পদ্ধতি হচ্ছে আইপি মাস্কিং যার মাধ্যমে মূল আইপিটি পরিবর্তন হয়ে অন্য মানুষের আইপি চলে আসে।

এছাড়াও অনেক ধরনের সরঞ্জাম এবং ইন্টারনেট সেবা আছে যার মাধ্যমে একটি আইপির ঠিকানা খুঁজে বের করা সম্ভব কিন্তু তা অনেক কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ।

ফিল্টারিং এবং ব্লকিং কি এবং এটা কিভাবে কাজ করে-

অনেক ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য অনলাইন সেবা সরবরাহকারীরা তাদের সেবা ব্যবহারকারীদেরকে যৌন নির্যাতন সামগ্রী সম্পর্কে ওয়েব ঠিকানায় ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। এছাড়াও, ইন্টারনেট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি শিশু যৌন অপব্যবহারের ভিডিও, ছবিগুলি পুনরুদ্ধার বা আপলোড করতে বাধা দিতে পারে। এভাবেই তারা ফিল্টারিং এবং ব্লকিং টেকনোলজি ব্যবহার করছে। এখন এই সম্পর্কে ওয়েব এড্রেসে যা কিছুই লেখা হোক না কেন সেগুলো ফিল্টার হয়ে সরাসরি ব্লক হয়ে যাবে। এই তালিকাটি একত্রিত করে পুলিশ সংস্থাকে দেওয়া হয়। ফিল্টারিং এবং ব্লকিং এর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট শব্দগুচ্ছ যেমন "শিশু যৌন নির্যাতন" তৈরি করা যেতে পারে।

যেখানে একটি নির্দিষ্ট ছবি ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে পরিচিত, সেখানে হ্যাশিং প্রযুক্তি, ফটো ডি.এন.এ বা ডিজিটাল আঙুলের ছাপ তৈরি করা যেতে পারে। তখন এই হ্যাশ তাদের ডাটাবেসে এবং সিস্টেমে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে এবং এটির মাধ্যমে তাদের সার্ভারে এরই মধ্যে এই ধরনের কোন ছবি আপলোড বা ডাউনলোড হয়েছে কিনা সেটা খুঁজে বের করা যায়।

শিশু যৌন শোষনের উপকরণ ফিল্টারিং এবং ব্লকিং করা-

প্রযুক্তির ফিল্টারিং এবং ব্লক করার পিছনে কারন হল অনলাইনে শিশু যৌন নিপীড়নের উপকরণের মাত্রা কমিয়ে দেয়া বা সীমিত করে দেয়া। এভাবে ফিল্টারিং করা হলে অনেক ধরনের খারাপ ও নেতিবাচক কন্টেন্ট প্রতিরোধ করে একটি নিরাপদ ইন্টারনেট সেবা প্রদানে অবদান রাখে। এর মাধ্যমে অভিযুক্তদের শিশু যৌন নিপীড়ন সামগ্রী সম্পর্কে আগ্রহ বা জানা থেকে বিরত রাখছে। আরও সুবিধা হচ্ছে এটা একটা ভিক্টিমকে তার খারাপ ছবি প্রকাশ থেকে বিরত রাখছে। এই ছবি গুলোতে প্রবেশাধিকার, ফিল্টারিং এবং ব্লক করা পদ্ধতিতে ভিক্টিমের গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং শিশুদের ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্ভাবনা কমাতে পারে।

এনক্রিপশন কি-

এনক্রিপশন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের ক্রম প্রয়োগ যার মাধ্যমে একটি বার্তা গোপন উপায়ে লিপিবদ্ধ হয় যেটি ভুল হাতে পড়লেও সেই ব্যক্তি দেখতে পাবে কিন্তু পড়ে বুঝতে সক্ষম হবে না। এটা মেসেজ কে এমন ভাবে পরিবর্তন করে যেমনঃ "I will meet you on Monday" এটার এনক্রিপশন হতে পারে "p98hUIs#yeন"। অস্পষ্ট কোডেড বার্তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে রিসিভারকে পাঠানো হয়। যে মেসেজটি পাবে তার অবশ্যই একটি ডিক্রিপশন পাসওয়ার্ড থাকতে হবে যেটি অন্য আর কেউ জানে না। এই ডিক্রিপশন পাসওয়ার্ড দিলেই রিসিভার তার আসল মেসেজটি দেখতে পাবে। এই ডিক্রিপশন পাসওয়ার্ড ছাড়া এই মেসেজ বা ছবি কোন ভাবেই দেখা সম্ভব নয়।

অনলাইনে শিশু যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে এনক্রিপশন কিভাবে ব্যবহৃত হয়-

শিশু যৌন অপরাধীরা অনলাইনে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে যেন তাদেরকে সনাক্ত করা না যায় বা কর্তৃপক্ষের নজরে না আসে। অপরাধীরা শিশু যৌন নির্যাতনের তথ্য এনক্রিপ্ট

করে তাই এটি অন্য ব্যক্তি দ্বারা ধরা বা বোঝা সম্ভব হয় না। অথবা তারা তাদের কম্পিউটার বা হার্ডডিস্ক এনক্রিপ্ট করে রাখে যাতে কর্তৃপক্ষ তাদের বাসা তল্লাশি করলেও কোন তথ্য বের করতে না পারে। উপরন্তু, এনক্রিপশন অপরাধীদেরকে অনলাইনের তাদের পরিচিতি যাচাই করে যারা অনলাইনে যোগাযোগ করতে চায়। কিছু দুর্বল এনক্রিপশন শক্তিশালী কম্পিউটার দিয়ে ভেঙে ফেলা সম্ভব কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই এনক্রিপশন গুলো অনেক শক্তিশালী হয়ে থাকে যেটা ডিক্রিপশন পাসওয়ার্ড ছাড়া কখনও ভাঙা সম্ভব নয়। এনক্রিপশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্তে অতিরিক্ত জটিলতার সৃষ্টি করে।

টর কি-

টর বেনামী যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য একটি বিনামূল্যের সফ্টওয়ার। প্রাথমিকভাবে টর নেটওয়ার্ক একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক সার্ভার; যা ইউএস নেভি দ্বারা উন্নয়নকৃত এবং বিশ্বব্যাপী ইউজারদের অনলাইনে তাদের পরিচয় লুকিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিলো। টর প্রোজেক্ট মূলত একটি অলাভজনক সংগঠন; যারা অনলাইন গোপনীয়তা টুল তৈরি করাকে গবেষণার মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখে। টর নেটওয়ার্কে আপনার অনলাইন পরিচয়কে ছদ্মবেশে বিভিন্ন টর সার্ভার দিয়ে এনক্রিপশন করিয়ে তারপরে সেই ট্র্যাফিককে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো হয়; ফলে টর ব্যবহারকারীর পরিচয় ট্র্যাক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটির মাধ্যমে কোন ওয়েবসাইট দেখলে বা মেসেজ আদান প্রদান করলে সেটা চিহ্নিত করা বা কোথা থেকে এই ডাটা আসছে সেটাও বের করা সম্ভব হয় না।

অনলাইনে শিশু যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে টর কিভাবে ব্যবহৃত হয়-

শিশু যৌন অপরাধীদের শিশু যৌন নির্যাতনের চিত্রগুলি বা অন্যান্য সামগ্রী যা শিশু যৌন নির্যাতন সম্পর্কে একটি খারাপ সংস্কৃতি তৈরি করে তোলে এবং সেটি শেয়ার করার জন্য টর ব্যবহার করে। শুধু তাই নয় টর সম্ভাব্য ভিক্টিমকে টর ব্যবহার করে শিশু যৌন নির্যাতনকারীদের সাথে নিজের

পরিচয় গোপন রেখে যোগাযোগ করতে সহায়তা করে। এমন কি টরের গোপন সেবা এই ধরনের ভিক্টিমকে শিশু যৌন নির্যাতনকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করে। টর ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধীর সনাক্ত হওয়া বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ইন্টারনেট সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠান এর হাতে ধরা পরার কোন ভয় থাকে না। তাই টর সফটওয়্যার ব্যবহারকারী অপরাধীকে সনাক্তকরা কঠিন হয়ে পড়ে। এটা সত্য যে, সব থেকে বেশি শিশু যৌন বিষয়ক তথ্য উপাত্ত টরের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হয়।

হ্যাস কি? ফটো ডিএনএ কি? কিভাবে এগুলো কাজ করে?

ফটো ডিএনএ একটি চিত্রের মাধ্যমে শুরু হয় যা বিশ্বস্ত সূত্র (ন্যাশনাল সেন্টার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা) থেকে শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী চিহ্নিত করতে পারে। ফটো ডিএনএ ছবি গুলোকে সাদা কালো এবং একটা অভিন্ন আকারে রুপান্তরিত করে। এটি তারপর চিত্রগুলিকে বর্গাকারে বিভাজন করে এবং একটি সংখ্যাসূচক মূল্য প্রদান করে যা প্রতিটি বর্গক্ষেত্রে পাওয়া অনন্য ছবিকে প্রতিনিধিত্ব করে। এক সাথে এই সংখ্যা সূচক মানগুলো ছবি গুলোর জন্য হ্যাশ গঠন করে।

হ্যাশ এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি ছবি অন্য আরেকটি ছবির সাথে তুলনা করে একই ধরনের অন্যান্য ছবি সনাক্ত করতে পারে। যেমন গুগল ইমেজে কোন ছবি আপলোড করে ঐ ছবির মত অন্যান্য সকল ছবি খুঁজে বের করা যায়।

১) অনলাইনে ক্ষতিকারক সামগ্রী গুলো সনাক্ত বা চিহ্নিত করা।

২) অনেক ছবি থেকে প্রয়োজনীয় ছবি খুঁজে বের করা।

হ্যাশ প্রতিটি চিত্রের জন্য একটি অনন্য ডিজিটাল শনাক্তকারী বা স্বাক্ষর প্রতিনিধিত্ব করে। এমনকি যদি ছবিটি পরিবর্তিত করা হয়- যখন ছবিটি পুনরায় আকার দেওয়া হয় বা রঙিন হয় এবং যাই করা হোক না কেন সেই হ্যাশকোডটি সেই চিত্রের জন্য একই থাকে।

আইনের প্রয়োগ-

VIC প্রকল্প এমন একটি প্রকল্প যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যবহার করে থাকে এবং আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে শোষিত শিশুদের জন্যও ব্যবহৃত হয়। পরিচিত শিশু যৌন নির্যাতনের উপাদান প্রকল্প VIC এর লক্ষ লক্ষ ডিজিটাল হ্যাশেস ডেটাবেস ব্যবহার করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অজানা শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী থেকে ইতিমধ্যে পরিচিত চিত্রগুলি সনাক্ত করে। এটি পরিচিত ইমেজগুলির অনুলিপিগুলিকে পুনরায় তদন্তের জন্য সামনে আনে এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে নতুন করে চিত্রগুলির উপর নজর রাখতে সহায়তা করে এবং যে শিশুরা এই প্রকল্পের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাদের চিহ্নিত করতে পারে। এই প্রকল্প VIC সর্বোচ্চ তদন্ত করতে সাহায্য করে। এভাবে অপরাধীদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান পদ্ধতিতে বিপুল তথ্য পাওয়া যায়।

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী-

ফটো ডিএনএ দ্বারা তৈরি হ্যাশগুলির সেট ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইটগুলির সাথে শেয়ার করা হয়। হ্যাশ টেকনোলজি তাদের পরিষেবাতে শেয়ার করা শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী সনাক্ত করতে সহায়তা করে, কারণ এটি শিশু যৌন নির্যাতনের উপাদানগুলির সনাক্তকরণ, অপসারণ বা ব্লক করা এবং রিপোর্ট করতে সক্ষম।

ক্লাউড কম্পিউটার-

ঐতিহ্যগতভাবে যখন কেউ কোন কম্পিউটারে কিছু তৈরি করে বা গান সংগ্রহ বা ছবির মতো জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে চায়, তখন তাদেরকে এটি হার্ড ড্রাইভে বা অন্য মাধ্যম যেমন সিডি বা ইউএসবি ড্রাইভে রাখতে হত। কিন্তু যখন এই ড্রাইভের জায়গা শেষ হয়ে যেত তখন অতিরিক্ত ড্রাইভ কেনা লাগত। পাশাপাশি কোন সফটওয়্যার চালাতে গেলে সেটা অবশ্যই কিনে বা ডাউনলোড করে রাখা লাগত নতুবা ব্যবহার করা যেত না। কিন্তু ইন্টারনেট আসার পর

থেকে এইখানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এটা তখন ক্লাউড কম্পিউটার স্পেস এর জায়গা করে দেয়। এর মানে হল আমরা এখন যেকোন বড় ফাইল, তথ্য, সফটওয়্যার রিমোট সার্ভারের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি। এর কারন হচ্ছে ইন্টারনেট এখন সমস্ত বিশ্বে এবং সবসময় চালু থাকে, আমরা এখন এমন একটি মোবাইল কম্পিউটার এর যুগে বসবাস করছি যেখানে ইচ্ছা করলে যে কোন কিছু যখন তখন ব্যাকআপ বা রিস্টোর করতে পারি। কোম্পানি গুলো ক্লাউড সেবা গুলোর জন্য হোস্ট করে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ব্যবহারকারীরা যখন তখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেখানে প্রবেশ করতে পারে এবং তাদের জন্য যেটা দরকার সেটা হল একটি ডিভাইস এবং সেখানে প্রবেশের একটি একাউন্ট। কিছু কিছু সার্ভার সামান্য টাকা চার্জ করে থাকে তাদের কম্পিউটার কেনা, বসানো, এবং হার্ডওয়ার-সফটওয়্যার সর্বদা তদারকির জন্য।

অপরাধীরা কিভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ব্যবহার করছে-

অপরাধীরা বিভিন্ন সাইবার স্পেস ব্যবহার করে যেমন "সাইবার লকার", যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী সংরক্ষন করে রাখতে পারে। যেমন; গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্স ওয়ান ড্রাইভ, আই ক্লাউড এই ধরনের লকার গুলো পাসওয়ার্ড দ্বারা বন্ধ করা থাকে যা একমাত্র ঐ একাউন্ট ধারীর দেওয়া পাসওয়ার্ড ছাড়া খোলা সম্ভব নয়। অপরাধীরা টাকার বিনিময়ে এসব শিশু যৌন নির্যাতনের সামগ্রী একে অপরের সাথে আদান প্রদান করে। সেবা প্রদানকারী কোম্পানি গুলোর কোন ভাবে এটা বোঝা সম্ভব নয় যে এই লকারের ভেতরে কি ফাইল আছে।

এই ধরনের স্পেস গুলো এ ধরনের শিশু যৌন নির্যাতন এর ছবি তোলে বা সংগ্রহ করে তাদের জন্য ব্যবহার করা হয় যাতে কোন কর্তৃপক্ষ এটা কোন দিন ধরতে না পারে। অপরাধীরা এভাবেই তাদের বাসায় এই ধরনের কোন কিছু না রেখে বা বহন না করে সরাসরি ইন্টারনেটে আপলোড

করে দেয় এবং প্রয়োজনে সেখান থেকে নামিয়ে নেয়। ক্লাউড কম্পিউটিং সিস্টেম টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। ইন্টারনেটে এমন লক্ষ ফাইল প্রতিদিন আদান প্রদান হলেও এনক্রিপটেড হওয়ায় তাতে প্রবেশ করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে ক্লাউড কম্পিউটিং সিস্টেম সেবা দানকারী কোম্পানি গুলো সমস্ত বিশ্বে তাদের সার্ভার বসাচ্ছে যাতে সকল জায়গা থেকে গ্রাহক পাওয়া যায়। এই অপরাধের ফলে কোন দেশের আইনে এর বিচার হবে এবং কোন দেশের পুলিশ কোন পদ্ধতিতে এই কেস গুলো তদন্ত করবে তা নির্ণয় কঠিন হয়ে যায়।

স্প্ল্যাশ পেজ কি? এটা কিভাবে কাজ করে?

স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা এমন একটি পৃষ্ঠা বা চিত্র যা সম্পূর্ণ পর্দায় বা এটির একটি অংশে প্রদর্শিত হয় যখন ব্যবহারকারীর ওয়েব পেজটি লোড হয়। স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা এমন একটি পৃষ্ঠা যা কোন ওয়েব এড্রেসে গেলে দৃশ্যমান হয় যেটায় কোন মেসেজ বা বার্তা থাকে। বিজ্ঞাপনদাতারা এগুলো ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করে অথবা সাইটে এমন কিছু লিখে দেয় যে সাইটটি ভুল বা এখন চালু নেই। স্পাশ পৃষ্ঠা মানুষকে কিছু জিনিস না দেখা থেকে বিরত থাকতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি শিশু যৌন নির্যাতন সম্পর্কে কিছু দেখতে চাইলে এটা সাইটে একটা মেসেজ দিবে এবং সেই ধরনের ফাইল গুলো দেখা বা ডাউনলোড করা থেকে বিরত রাখবে।

শিশু যৌন শোষণ উপকরণ পাওয়া থেকে বিরত রাখে:

স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা কিছু কোম্পানি ব্যবহার করে থাকে যেমনঃ গুগল, মাইক্রোসফট। সার্চে শিশু যৌন নির্যাতন সম্পর্কে কোন মানুষ ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত লিখলে সেখানে যাওয়া থেকে বাধা দেয়। কেউ যেতে চাইলেই পেজ সয়ংক্রিয় ভাবে যেতে দিবে না। স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা ব্যবহার করলে গ্রাহকরা পরবর্তীকালে এই ধরনের মেসেজ এর বাধার সম্মুখীন হবে। স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা বিভিন্ন ধরনের মেসেজ ধারন করতে পারে। একটা পৃষ্ঠা উক্ত সাইটে প্রবেশ করা বা না করা সম্পর্কে মেসেজ ধারন করতে পারে। এটাকে বলা হয়

"Error Message" বা "404 message"। স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা কেন এই সাইটটি ব্লক করে রেখেছে সেটার কারন ও লিখে দিতে পারে। এই ধরনের তথ্যে আরও ব্যাখ্যা দিতে পারে যে সেটা শিশুদের জন্য কেন ক্ষতিকর এবং ভাল উপদেশমূলক মেসেজও থাকতে পারে।

এছাড়াও স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা অবৈধ ব্যবহারকারীদের এই ধরনের সার্চ থেকে বিরত রাখার জন্য মেসেজ দেখাতে পারে। যেসব ব্যবহারকারী এইসব বিষয়বস্তু ব্লক করেন না, তারা কিভাবে স্ব-ইচ্ছায় ব্লক করতে পারবেন সেটার তথ্য জানিয়ে দেয়। ব্যবহারকারীদের জন্য যারা এইসব বিষয়বস্তু ব্লক করে না, কখনও কখনও তারা এই সম্পর্কে কিভাবে নিজেরাই ব্লক করবে সে সম্পর্কে তথ্য দেওয়া দেয়। অবশেষে কিছু স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা অনলাইনে শিশুদের যৌন অপব্যবহারের সামগ্রী রিপোর্ট এর হটলাইন লিঙ্ক দিয়ে থাকে। ওয়েবসাইটে স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা এর এই ধরনের ব্যবহারে শিশু যৌন নির্যাতনের অপকারিতা সম্পর্কে ধারনা বাড়ানো বা নৈতিকতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর ভেতরে একটা শিশু যৌনতা সম্পর্কে একটা ভয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা গুলির সাহায্যে ব্যবহারকারীর রিপোর্টিং পদ্ধতিতে তাদের অনুসন্ধান সামগ্রীতে অনাকাক্ষিত জিনিস দেখা থেকে ব্যবহারকারীকে সুরক্ষিত করে একটি নিরাপদ অনলাইন পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে। শেষে স্প্ল্যাশ পৃষ্ঠা গুলো ব্যবহারকারিদের এসব পেজে ঢুকতে বাধাদান করে।

সন্তানের সাথে মা-বাবার সম্পর্ক কেমন হওয়া প্রয়োজন, অভিভাবকদের ভূমিকা ও করনীয় কি?

আমরা সবাই সন্তান জন্মের সাথে সাথে মা- বাবা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করি। কথাটি আংশিক সত্য কারন সন্তান জন্ম দেবার পাশাপাশি মা-বাবাকে সন্তান লালন পালনের কৌশলসমূহ খুব ভালভাবে জেনে অনুশীলন করতে হয়। কেননা সন্তানের সাথে মা-বাবার সম্পর্ক গভীর। আর এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সন্তানকে আদর ভালবাসা দেওয়া, পরিপূর্ণভাবে যত্ন নেওয়া যাতে করে সন্তানের সব ধরনের বিকাশ সাধিত হয়। এজন্য সন্তানের সব ধরনের বিকাশ নিশ্চিত করতে বাড়িতে এমন পরিবেশ তৈরি করা যেখানে সন্তান মনোযোগ পায়, শিখতে উৎসাহী হয় এবং সবমিলে একটি শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়। মা- বাবার দায়িত্ব হলো সন্তানের সাথে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা যেখানে সন্তানের শারীরিক, মানসিক আবেগীয়, বুদ্ধিবৃত্তীয়, নৈতিকতা গঠনের বিষয়গুলি নিশ্চিত হয়। তাছাড়া সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রকম চাহিদা তৈরি হয় আর সেটা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তি হতে থাকে। সেজন্য মা-বাবাকে সন্তানের চাহিদা বুঝে পূরণ করা অত্যন্ত জরুরী। প্রত্যেকটি মানুষ যেমন স্বতন্ত্র ঠিক তেমনি তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলি ভিন্ন হওয়া খুব স্বাভাবিক। আর তাই একই মায়ের একাধিক সন্তানের ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য। ঠিক তেমনি একজন সন্তানের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলির সাথে অপর সন্তানের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলি তুলনা করা সমীচীন নয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানের চাহিদা জেনে তা যদি কোন মা-বাবা পূরণ করতে নাও পারে সেক্ষেত্রে কারনগুলো খুব পরিস্কারভাবে সন্তানকে জানালে মা-বাবার প্রতি সন্তানের আস্থার জায়গায় সুদৃঢ় হয়। যেমন: কর্মজীবী কোন মাকে যদি তার সন্তান অফিসে যেতে মানা করে এবং মাকে যদি সেদিন তার গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অফিসে যেতেই হয়, না গেলে কি কি ক্ষতি হতে পারে কিংবা বাসায় ওয়াইফাই ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় সন্তানকে সুযোগ দিলে ছোট সন্তানকে না দিলে কেন ছোট জনকে মা-বাবা বর্তমানে সুযোগ দিতে পারছেন না সে বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে সন্তানের কাছে তুলে ধরা

জরুরী। যে কোন অপারগতার কথা স্বত:স্ফূর্তভাবে মা-বাবাকে তার সন্তানের কাছে উপস্থাপন করা প্রয়োজন তানাহলে সম্পর্কের মধ্যে দুরত্ব তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে কোন কিছু বলার আগেই সন্তান ভেবে নিতে পারে মা-বাবা তার আবদার মানবে না এবং না করে দিতে পারে। এতে করে দুরত্ব বাড়তে পারে। অনেক মা-বাবাই মনে করেন যে সন্তান যখন খুব ছোট থাকে কেবল তখনই শুধু সন্তানের ভালভাবে যত্ন নিতে হয়, বড় হবার সাথে সাথে বাবা মায়ের দায়িত্ব একদম কমে যায়। কেউ কেউ মনে করেন সন্তান বড় হয়ে গেলেও তাদের সব রকম দায়িত্ব মা-বাবার, সন্তানের সব ধরনের বিষয়ে মা-বাবাই সিদ্ধান্ত নিবেন। প্রকৃতপক্ষে ছেলে মেয়ে পুরোপুরি পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত মা বাবাকে তাদের যত্ন নিতে হয়। আর সেজন্য সন্তানের বিকাশ উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে মা-বাবাকে সব সময় কৌশলী হতে হয়। মা-বাবার কিছু করনীয় পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হল:

বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করা

মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। সন্তানদের যদি মা-বাবার উপর আস্থা না থাকে তবে সে তার মনোভাব, ভালো লাগা, আগ্রহ, কৌতূহল ও পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলি মা-বাবার সাথে আলোচনা করে না। ফলে মা-বাবা তার নিজের সন্তানকে অহেতুক সন্দেহ করেন, যা মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা

মা-বাবারা যেনো কর্তৃত্বসুলভ নির্দেশনা প্রদান না করে সহজ স্বাভাবিকভাবে সন্তানকে বলার অভ্যাস গড়ে তোলে যাতে করে সন্তানের মনে ভীতির সৃষ্টি না হয়, ভয় না পায়। যে সময়টুকু সন্তানের জন্য মা-বাবারা দিবেন বলে মনে করেন সেটা যেনো শুধুমাত্র সন্তানকে দেন তার জন্য পুরোপুরি মনোযোগ সে সময়ের জন্য অন্য কাজ থেকে আলাদা করে রাখেন। মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বপূর্ণ যা বিশ্বাসের জন্ম দিবে, সুখে- দুঃখে

একসাথে থাকার শক্তি যোগাবে, মনের কথা বলতে উৎসাহ পাবে, বিপদে পড়লে সবার প্রথম বাবা-মায়ের সাথে শেয়ার করবে এবং এই সম্পর্কের ফলে একজন আরেকজনের উপস্থিতিকে উপভোগ করবে।

কোন বিশেষ নামে ডাকা

সন্তানকে কোন বিশেষ নামে ডাকার অভ্যাস গড়ে তোলা যাতে করে যে কোন বিষয়ে দুই পক্ষের মতের অমিল হলে কিংবা কোন কারনে মন খারাপ হলে মা-বাবা যদি বিশেষ মুহূর্তে সেই নামে ডেকে উঠে এবং কাছে টেনে নেয় তাহলে দুরত্ব কমে আসে এবং সন্তান ও মা-বাবার মধ্যে সম্পর্কে গভীরতা তীব্রতর হয়।

ঘুমানোর সময় পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করা

সন্তান যত বড় হয়ে যাক না কেন মা-বাবার কাছে সে সবসময় ছোটই থাকে। আর সেজন্য দিনের শেষে যখন ঘুমাতে যাওয়ার সময় হয় তখন একটু সময় বের করে সন্তানের বিছানায় গিয়ে গল্পের ছলে তার সাথে জীবনের বিভিন্ন দিকের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা এবং প্রতিটা বিষয়ে বাস্তবতাগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা যেনো পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের ক্ষেত্রে ভালভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সন্তানকে সময় দেওয়া

সন্তানকে সফলভাবে গড়ে তুলতে গেলে সময় দেওয়ার কোন বিকল্প নেই। ব্যস্ততা সন্তানকে নিজের থেকে দূরে রাখার কোন অজুহাত হতে পারে না। অনেক বাবা-মাই নিজেদের অনুপস্থিতিকে পূরণ করার জন্য সন্তানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক দামী দামী উপহার কিনে দেন। কিন্তু উপহার কখনোই বাবা-মায়ের উপস্থিতির বিকল্প হতে পারে না। সবসময় কাছে না থেকেও যদি মানসম্মত সময় নিজের সন্তানকে দেয়া যায় যেমন; সেই সময়টিতে সন্তানরা মা-বাবার সাথে থাকতে পারে, মা-বাবার সাথে মিশতে পারে, মা-বাবার উপস্থিতিকে উপভোগ করতে পারে, নিরাপদ ও স্বস্তিবোধ করে, মা-বাবার ভালবাসাকে অনুভব করতে পারে, যা শেখাতে চাই তা আনন্দের সাথে শিখতে পারে।

এক সাথে বসে খাওয়া

সারাদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও রাতের খাবার, ছুটির দিনে দুপুরের খাবার কিংবা ছুটির দিনে পরিবারের সকল সদস্য একসাথে কোথাও বাইরে বেড়াতে গিয়ে পরিবারের সবাই একসাথে বসে খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা যাতে করে সকলের সাথে ভাবের আদান প্রদান হয়, সারাদিন কে কি করা হল তা শেয়ারিং এর সুযোগ হয়, নিজেদের সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং একজন আরেকজনের বিষয় জানতে পেরে সেখান থেকে শিক্ষনীয় দিকটি নিজের জন্যে নিয়ে নিজের জীবনে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়।

সন্তানের পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া

যে সকল বিষয়গুলোতে সন্তানের মতামত নিলে বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের আস্থা তৈরি এবং পারস্পরিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় সে বিষয়গুলি যেমন; নিজের পছন্দে পড়ার টেবিল সাজানোতে অগ্রাধিকার দেয়া, পোশাক নির্বাচনে সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া, ছুটির দিনে রান্নার মেন্যু কি করা যায় তা সকল সন্তানের কাছ থেকে জেনে সবার পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে আয়োজন করা, মাঝে মধ্যে কোন খাবার খেতে চায় তা জেনে তার পছন্দমত খাবার টেবিল ডেকোরেশন করা ইত্যাদি।

শান্তিপূর্ণ গৃহ পরিবেশ রাখা

সন্তানকে সফল এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে তুলতে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ গৃহ পরিবেশের কোন বিকল্প নেই। গৃহ পরিবেশ সামাজিক ও শারীরিক দুই রকম পরিবেশকেই বোঝায়। বাড়ির আকার-আয়তন, সাজানো-গোছানো অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কথাবার্তা, চলাফেরা, আচার-আচরন, একজনের সাথে অপরের সম্পর্ক অর্থাৎ শারীরিক পরিবেশ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে একে অপরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, প্রশংসা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, কাজের স্বীকৃতি ও প্রশংসা করার চর্চা গড়ে তুলতে হবে। যেমন; ঘরে কোন আসবাবপত্র কিংবা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস কেনার সময় সন্তানকে দিয়ে উপকরণ সমূহের তালিকা প্রনয়ন করা, কোন কোম্পানী বা ব্র্যান্ডের

ডিভাইস বাজারে আপডেট আছে তা সন্তানের কাছ থেকে জেনে নেয়া, কোন জায়গায় সন্তানরা বেড়াতে যেতে আগ্রহী তা জেনে পরিকল্পনা করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কোন ধরনের ভুল হলে তার জন্য ইতিবাচকভাবে সন্তানকে বুঝিয়ে বলা এবং পরবর্তী কাজের সময় যেনো খেয়াল করে তার জন্য পরিস্কারভাবে মা-বাবাকে ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে। এ ধরনের পরিবেশ,বিশ্বাস,পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, একজন আরেকজনকে সাহায্য করার প্রবনতা, সুখে দুখে একজন আরেকজনের পাশে থাকা সর্বোপরি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে সন্তান সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে।

সন্তানকে জীবনে গুরুত্ব দেয়া

অভিভাবকদের কাছে তাদের সন্তানেরা সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কখনও কখনও সন্তানরা সেটা উপলব্ধি করতে পারে না সেজন্য অভিভাবকদের দায়িত্ব হচ্ছে যে কোন কাজের মধ্য দিয়ে আচরনের মাধ্যমে তা সন্তানের কাছে প্রতিফলিত করা যাতে করে বাবা-মায়ের কাছে সন্তান বন্ধু হিসেবে নির্ভরতা পায়, যে কোন সমস্যায় পড়লে তা নিয়ে শেয়ার করে, সব সময় বাবা-মাকে তাদের বন্ধু মনে করে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সে ধরনের একটি পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সন্তান যেনো উপলব্ধি করে মা-বাবা হচ্ছে সবচাইতে বড় বন্ধু যার কাছে নিজের জীবনের সকল বিষয় খুলে আলোচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে মা-বাবাকে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে আর তা হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সন্তানরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবে যেখান থেকে সে নিজেই বাছাই করে নিবে কোন বিষয়গুলি সে তার মা-বাবার সাথে বলবে, কোন বিষয়গুলি সে তার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। কারো কাছ থেকে জেনে মা-বাবা যেনো তার সন্তানদের ভুল না বোঝেন, কৈফিয়ত না চান, এমনকি সন্তানকে দূরে সরিয়ে না দেন। সন্তান যেনো নিজে থেকেই তার বন্ধুত্বের বাউন্ডারি নির্ধারণ করে চলতে পারে তার জন্য মা -বাবাকে পাশে থেকে সাহস যোগাতে হবে। শুধুমাত্র নেতিবাচক কিছু দেখতে পেলে তার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকসমূহ নিয়ে সন্তানের সাথে কথা

বলবেন যাতে করে সন্তান তার সীমাবদ্ধতা গুলো বুঝতে পারে।

মজা করা

মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে মজার মজার কথা বলার অভ্যাস করা যাতে যেখানে মা-বাবারা তাদের sense of humour ব্যবহার করতে পারেন। রসবোধের ব্যবহার পারিবারিক পরিবেশকে সহজ করে তোলে। এতে করে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং পরিবারে সবাই সবার উপস্থিতিকে উপভোগ করে।

সামাজিক সম্পর্ক রক্ষায় সন্তানকে সহায়তা করতে বলা

সন্তানের সামাজিক দক্ষতা তৈরিতে মা-বাবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারের বাইরের লোকের সাথে মিশতে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথা বলতে, বন্ধুত্ব তৈরিতে এবং বন্ধুত্ব রক্ষায় মা-বাবাকে সন্তানের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। যে কোন সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক তৈরিতে সন্তানের পাশে মা-বাবাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। সন্তান যদি কোন বন্ধুর সাথে সম্পর্কজনিত সমস্যায় ভুগতে থাকে তাহলে সম্পর্কছেদ না করে তা নিরসনের জন্য বাবামাকে সংকট নিরসনে এগিয়ে যেতে হবে।

সন্তানদের মনিটরিং করার বিষয়ে বাবা-মায়ের ইতিবাচক করনীয়

প্রত্যেক মা-বাবারই তার সন্তানদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন থাকে। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অভিভাবক হিসেবে কেউ কেউ তার সন্তানের উপর অনেক কিছু আরোপ করে যা তার সন্তানকে কখনো কখনো মা-বাবা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেজন্য মা-বাবা এবং সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা খুব জরুরী। মায়ের শরীরে সন্তানের অস্তিত্ব অনুভব করা থেকে শুরু করে বের হওয়ার পর সন্তানের লালন-পালন এবং পরিচর্যা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বড় করে তোলা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে মা-বাবা অনেক দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি সন্তানকে

তার চারপাশের জগতে চলাফেরা করার সময় নিয়ম-কানুনের মধ্যে নিয়ে আসতে কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন যা সব সময় সব সন্তান মানতে চায় না। কেননা মা-বাবারা এই নির্দেশনা কেন দিচ্ছেন, সন্তানের জীবনে কি ঘটতে পারে, জীবন চলার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সামনে আসতে পারে, কোন ঘটনা ঘটে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে অভিভাবকরা যে সহযোগিতা করতে পারবেন সে সম্পর্কে কোন ধারনা প্রদান না করে কেবলমাত্র নির্দেশনা দিয়ে অবচেতন মনে সন্তানকে তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। এর ফলে সন্তান মা-বাবার কাছ থেকে কোন নির্ভরতার জায়গা না পেয়ে নিজেদেরকে আরো গুটিয়ে নেয়, কথা বলা বন্ধ করে দেয়, পারিবারিক সম্পর্ক জোরদারের জায়গাগুলো যেমন; একসাথে খাবার টেবিলে বসা, পরিবারের সাথে গল্প করা, নিজের বিষয়গুলি নিয়ে শেয়ার করা, পারিবারিক কোন অনুষ্ঠান এ অংশগ্রহন করা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আর এই জন্য প্রত্যেক মা-বাবারই ছেলেমেয়েকে বড় করে তোলার পাশাপাশি সন্তান কখন, কোথায়, কিভাবে, কার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, সমস্যায় পড়তে পারে সে বিষয়গুলি নিজেদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমন্বয় করে সন্তানের সাথে শেয়ার করবেন যাতে করে সন্তানেরা তাদের জীবন চলার পথে দৃষ্টান্তগুলো কাজে লাগাতে পারে। পাশাপাশি নির্দেশিকায় অনেকগুলো কেইস স্টাডি দেয়া আছে যেগুলো নিয়ে সন্তানদের সাথে শেয়ার করবেন । এক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে সন্তান দুজনকেই সমানভাবে তথ্য দেবেন যাতে করে একজন সম্পর্ক তৈরিতে নিজের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে সামনে এগোবে অপরজন সম্পর্ককে একটা মর্যাদার জায়গায় নিতে তার বন্ধুদেরকে উৎসাহ যোগাবে, কারো কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে তা থেকে সরিয়ে আনতে পদক্ষেপ নিবে। এছাড়া শেয়ারিং এর ফলে সন্তানরা মা-বাবার কাছ থেকে কি কি সুবিধা পেতে পারে তা পরিস্কারভাবে শেয়ার করে নিলে আস্থার জায়গা তৈরি হবে এবং সন্তান নিজেকে কখনো একা বোধ করবে না। আরো বেশি সচেতনভাবে পথ চলতে সক্ষম হবে।

অনলাইনে যৌন নির্যাতন বিষয়ে জাতীয় আইনে কী কী প্রতিকার রয়েছে?

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। তাই বাংলাদেশ সংবিধান এবং দেশীয় অন্যান্য আইনে তা সুরক্ষার জন্য বিধান রয়েছে। একইভাবে কেউ যদি অবৈধভাবে কারো শরীর ও সুনামের ক্ষতি করে তাহলে প্রচলিত আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে। নিম্নে এগুলো দেয়া হলো–

চলো করি শপথ - ইন্টারনেটে নিজেকে ও অন্যকে রাখি নিরাপদ

* ব্যক্তিগত তথ্য পাবলিক সাইটে শেয়ার করবো না
* সত্যতা যাচাই না করে কোনো তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকবো
* কারো ক্ষতির উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটে কোনো কিছু পোস্ট বা আপলোড করা থেকে বিরত থাকবো
* ইন্টারনেটে দায়িত্বশীল এবং সম্মানজনক আচরণ করবো ও অন্যদের উৎসাহিত করবো
* অনলাইনে সন্দেহজনক কিংবা অযাচিত কর্মকান্ড যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করবো

আইনের নাম	সংশ্লিষ্ট বিধান	শাস্তি	
		কারাদণ্ড	অর্থদণ্ড
শিশু আইন, ২০১৩	শিশু আদালত কর্তৃক শিশুর জিম্মাদার রক্ষণাবেক্ষণকারী বা প্রতিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োগের কথা বলে হস্তগত করে কিন্তু উক্ত শিশুকে অসৎ পথে চালিত করে বা যৌন কর্ম বা নীতিগর্হিত কোনো কাজে লিপ্ত হইবার ঝুঁকির সম্মুখীন করে, তাহলে তা এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। (ধারা: ৮০)	সর্বোচ্চ ৩ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদণ্ড	সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা অথবা উভয়দণ্ড
	এই আইনের অধীন বিচারাধীন কোনো মামলা বা বিচারকার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী কোনো প্রতিবেদন ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাবে না যা দ্বারা শিশুটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়। (ধারা: ৮১)		৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮	যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতীয়মান হয় যে, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য উপাত্ত দেশের বা উহার কোনো অংশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুন্ন করে বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে, তাহা হইলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উক্ত তথ্য উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার জন্য বিটিআরসিকে অনুরোধ করিতে পারিবেন। (ধারা: ৮)		
	যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে- ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো তথ্য প্রেরণ করেন যা আক্রমনাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক বা এমন কোনো তথ্য সম্প্রচার বা প্রকাশ করেন, যা	অনধিক ৩ বছর কারাদণ্ড	৩ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড

আইনের নাম	সংশ্লিষ্ট বিধান	শাস্তি	
		কারাদণ্ড	অর্থদণ্ড
	কোনো ব্যক্তিকে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ করতে পারে, বা কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য উপাত্ত প্রেরণ , প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন তাহলে সেটি হবে একটি অপরাধ। (ধারা: ২৫)		
	যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে কোনো মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন (দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার অধীনে কোনো অপরাধ করেন) তাহলে এটিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। ধারা: ২৯)	অনধিক ৩ বছর কারাদণ্ড	অনধিক ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড
পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২	কোন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি তৈরি করার জন্য যদি অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করে চুক্তিপত্র করে অথবা কোনো নারী, পুরুষ বা শিশুকে প্রলোভন দেখিয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্থিরচিত্র, ভিডিওচিত্র বা চলচিত্র ধারণ করার জন্য অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে তাহলে সেই ব্যক্তি অপরাধী বলে গণ্য হবে । (ধারা: ৮-১)	সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড	দুই লক্ষ টাকা জরিমানা
	কোনো ব্যক্তি পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তির সামাজিক বা ব্যক্তি মর্যাদাহানি হয় এবং ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ ও সুবিধা আদায় কিংবা ধারণকৃত পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে মানসিক নির্যাতন করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধী বলে গণ্য হবে। (ধারা: ৮-২)	সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড	দুই লক্ষ টাকা জরিমানা

আইনের নাম	সংশ্লিষ্ট বিধান	শাস্তি	
		কারাদণ্ড	অর্থদণ্ড
	কোনো ব্যক্তি ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করে। তাহলে সেই ব্যক্তি অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। (ধারা: ৮-৩)	সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড	দুই লক্ষ টাকা জরিমানা
	কোনো ব্যক্তি যদি পর্নোগ্রাফি প্রদর্শনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সমস্যা তৈরি করে তাহলে সেই ব্যক্তি অপরাধী বলে গণ্য হবে। ধারা: ৮(৪)	সর্বোচ্চ ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে
	কোনো ব্যক্তি ১. পর্নোগ্রাফি বিষয়, ভাড়া, বিতরণ, প্রকাশ্যে প্রদর্শন কিংবা প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা সংরক্ষণ করে। ২. পর্নোগ্রাফি প্রাপ্তি স্থান সম্পর্কে বিজ্ঞাপন প্রচার করে।	সর্বোচ্চ ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে
পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২	৩. এই উপধারায় যে বিষয়গুলো অপরাধী বলে বিবেচিত এমন কোনো কাজ সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। (ধারা: ৮-৫)		
	কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শিশুকে ব্যবহারের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি তৈরি, বিতরণ, মুদ্রন ও প্রকাশ করে কিংবা শিশু পর্নোগ্রাফি বিক্রয় সরবরাহ বা প্রদর্শন করে এবং শিশু পর্নোগ্রাফি বিজ্ঞাপন প্রচার করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধী বলে গণ্য হবে। (ধারা: ৮-৬)	সর্বোচ্চ ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে

অনলাইন যৌন নির্যাতনের শিকার হলে
কোথায় এবং কিভাবে যাবো?

প্রণয়নে
শিশু অধিকার ইউনিট
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
৭/১৭, ব্লক- বি, লালমাটিয়া
ঢাকা- ১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৮১০০১৯২
+৮৮-০২-৮১০০১৯৫
ওয়েব: www.askbd.org

আর্থিক সহযোগিতায়
terre des hommes
stops child exploitation

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)
ফোন: +৮৮ ০১৫৫৫ ১২১১২১
ইমেইল: inquires@ btrc.gov.bd

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (চইও)
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৬১৫৭৬৪
ইমেইল: dig. pbi@police.gov.bd

বাংলাদেশ কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (বিডি-কার্ট)
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৯১৯২৫২
ইমেইল: info@bdnet.org

INSIGHT
BANGLADESH
FOUNDATION

ইনসাইট বাংলাদেশ
হেল্প ডেস্ক: ০১৭৬৬৬৭৮৮৮৮
ওয়েব: insightbangladesh.org.bd
প্লট: ০৪, রোড: ০২, ব্লক: জি, মিরপুর :১, ঢাকা ১২১৬

ক্রাইম রিসার্চ এন্ড এ্যানালাইসিস ফাউন্ডেশন (ক্রাফ)
বাড়ি: ১৫, রোড: ৮, ফ্লাট: এফ (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন: +৮৮ ০১৯৮৮ ৮১৩৩৭৭, ইমেইল: info@crafbd.com
অনলাইন অভিযোগ:
https://www.facebook.com/groups/CrimeResearchandAnalysisFoundation
গোপনীয় অভিযোগের জন্য এখানে মেসেজ করুন:
https://www.facebook.com/CrimeResearchandAnalysisFoundation/

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৩৪২৯৮৯
ফেসবুক: www.facebook.com/ciccidbdpolice
ইমেইল: aspccscid@police.gov.bd

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহ